

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ■ ব্যারিস্টার আমীর -উল ইসলাম

ব্যারিস্টার আমীর -উল ইসলাম

# মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি



মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি  
ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

জন্মযুদ্ধ

Scan By Asif  
Omi Rahman Pial



কাগজ প্রকাশনা

## কম্পিউটার কম্পোজ

নিবেশ

কম্পিউটার কম্পোজ

প্রকাশক :

কাজী শাহেদ আহমেদ

কাগজ প্রকাশন

বাড়ি-৫০, রোড-২/এ

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা

ঢাকা-১২০৯

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

প্রচ্ছদ : প্রব এম

কম্পিউটার কম্পোজ :

সকাল কম্পিউটার

বাড়ি-৬০, রোড-২/এ

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা

ঢাকা-১২০৯

পরিবেশক :

রূপকথা

১৯, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ (৫তলা)

ঢাকা-১০০০

মূল্য : সাদা ৫০ টাকা

নিউজ প্রিন্ট ৩০ টাকা

(বিদেশে ৮ মার্কিন ডলার)

## উৎসর্গ

## মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের

## ভূমিকা

গত দু'দশকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতোটা লেখা উচিত ছিল, ইতিহাসবিদ, গবেষক বা অংশগ্রহনকারীরা ততটা লেখেননি ঠিকই, তবে প্রতি বছর কিছু না কিছু লেখা হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন তথ্য, জড়ো হচ্ছে ইতিহাসের উপাদান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য।

আজকের তরুন জন্ম থেকেই স্বাধীন দেশের নাগরিক কিন্তু এর জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যে কি মূল্য দিতে হয়েছে সে সম্পর্কে হয়ত তার ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। যদি সে ধারণা স্পষ্ট হয় তা হলে দেশ, স্বাধীনতা সম্পর্কে তার মমত্ববোধ অন্য মাত্রা পেতো। এর জন্য অবশ্য কম বেশি দায়ি আমরা সবাই। গত দু'দশকে রাষ্ট্রীয় পোষকতায় এবং নিজ চেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে অজস্র বই প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলার চেষ্টাই লক্ষ্যবীণ।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে গত দু'দশকে তার অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা। অর্থাৎ যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন যুদ্ধে বা প্রবাসী সরকারের সংগে বা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যারা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি বেঁচে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে যারা পেশাগতভাবে ইতিহাস রচনার সংগে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লেখা তাদের খুবই সামান্য। আমাদের জন্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণই উপাদান হিসেবে মূল্যবান।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত যে সব বইপত্র বেরিয়েছে তাতে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে অবরুদ্ধ দেশ, প্রবাসী সরকার বা সংগঠন সম্পর্কে; রণাঙ্গন বা সশস্ত্র সংগ্রামের বর্ণনা আছে, প্রচেষ্টা আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ছিল বিভিন্ন সংগঠন। তবে প্রবাসী সরকার, তার নেতৃবৃন্দ, স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনায় বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্য সহায়তা বা বিরোধিতা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। তবে, সমস্যা হচ্ছে এ ধারার বইয়ের সংখ্যা কম হতে পারে, প্রবাসে এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যার বিবরণ কেউ দিতে চান না।

এ ধারার বইয়ের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ক'জন নেতা প্রথম প্রবাসী সরকার সংগঠন করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও তার সংগেই সরকারি পর্যায়ে প্রথম দিল্লীর সংগে যোগাযোগ হয়েছিলো। স্বাধীনতার পরও সরকারে ছিলেন তিনি এবং এখন পর্যন্ত যুক্ত আওয়ামীলীগের রাজনীতির সংগে।

গত এক দশক ধরে এরশাদের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সোচ্চার প্রতিবাদ উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিলো দেশবাসীকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আইনজীবীদের সংগঠন ও অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠনে থেকে স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে যে ক'জন গত বছর গুলোতে রাস্তায় ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাদের মধ্যে অন্যতম। গত বছর সরকার উৎসাহিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনেও তিনি ছিলেন তৎপর।

আমীর-উল ইসলামের স্মৃতিচারণ পর্বের শুরু ১৯৭১ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা আগমন থেকে। তাঁর স্মৃতিচারন থেকে জানা যায়, ভুট্টো আসলেই সমঝোতা চাননি, নির্ভর করছিলেন তিনি ক্যান্টনমেন্টের ওপর যেমন এখনও করে থাকেন অনেক রাজনীতিবিদ। পচিশ মার্চ এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এ সম্পর্কেও জানতেন আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ। শেষ মুহূর্তেও তাজউদ্দিন আহমেদ, আমীর-উল ইসলাম প্রমুখ চাপ দিয়েছিলেন প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর যাতে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি।

তাজউদ্দিনের আহমেদের সংগে একত্রে আমীর-উল ইসলাম চলে যান সীমান্তের ওপারে এবং তাদের সংগেই প্রথম দিল্লীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে তিনি প্রবাসী সরকার গঠনে প্রতিবন্ধকতা, দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোমালিন্যের কথা অকপটে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু নতুন তথ্য জানা যায়। মুজিব বাহিনী কি ভাবে গঠিত হলো সে ইতিহাসও বিধৃত হয়েছে। স্মৃতি কাহিনীর প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে কি ভাবে তাজউদ্দিন আহমেদ ধৈর্য্য, প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে প্রবাসী সরকার সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছিলো। এ স্মৃতি কাহিনী পড়ে মনে হয়, তাজউদ্দিন আহমেদ না থাকলে হয়তো আমাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়তো। তৎকালীন মেজর ও পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কেও বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আছে এ গ্রন্থে।

প্রবাসী সরকার সম্পর্কে এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সবচেয়ে কম। কারণ, সবাই হয়ত ঐ সময়টা ভুলে থাকতে চান ব্যারিস্টার এম.আমীর-উল ইসলাম ঐ সময়টি স্মরণ করে স্মৃতিচারণ করেছেন সে জন্য তিনি আমাদেরও ধন্যবাদার্থ। এ কারণে হয়ত তিনি অনেকের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হবেন, কিন্তু আমাদের বলতে দ্বিধা নেই, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার সময় তার স্মৃতিকাহিনী মূল্যবান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ইতিহাস বিভাগ

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পৌষ, ১৩৯৭

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি দলের পক্ষে এত বেশী আসন লাভ করার নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি।

নির্বাচনের পর ৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জন সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ৬ দফার প্রতি সংসদ সদস্য সহ সকলকে অবিচল থাকার আহ্বান জানান ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জনসভার প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধু নব-নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ করান। এই ধরনের গণ শপথ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এর কিছু দিন পর নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংবিধান রচনার জন্য আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল সংবিধান প্রণয়নের জন্য সাব কমিটি গঠন করে ঐ কমিটিতে আমিও একজন সদস্য ছিলাম। দলের নির্দেশ অনুযায়ী সাব-কমিটি সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকা আসেন। নির্বাচনের পর পর ভুট্টো ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনার বিরোধিতা শুরু করেন। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আলোচনার দরজা বঙ্গবন্ধু খোলা রাখেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধিদলের সাথে সর্ব প্রকার যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু আমার ওপর অর্পণ করেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধিদলকে যথেষ্ট সম্মান ও সৌজন্য দেখানো হয়। ভুট্টো বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। আমার দলের বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ সহ বঙ্গবন্ধু এবং ভুট্টো সহ তার প্রতিনিধি দলের সদস্যরা একদিন নৌ ভ্রমণে বের হয়। ঐ নৌ বিহারেই আলোচনায় পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান সহ নানা বিষয় নিয়ে নানাবিধ আলোচনা হয়।

ভুট্টোর কয়েকজন বিশিষ্ট সহকারীর সাথে আমার কথা হয়। এদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় সহকারী ব্যারিস্টার কামাল আফজার সহ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ আমার সার্কিট হাউজ রোডের বাসভবনে আমার সাথে দেখা করেন। ভুট্টোর দলের নেতাদের সাথে আলোচনার পর এটা বেশ বুঝতে পারি যে তারা ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। ভুট্টো ও তার সহযোগীদের অনমনীয় মনোভাব থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আলোচনার পূর্বে ও পরে জনাব ভুট্টোকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল থেকে আনা নেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। একদিন আলোচনার পর ভুট্টোকে নিয়ে গাড়ীতে করে যখন হোটেলে যাচ্ছিলাম তখন তাকে ভীষন গল্টীর দেখি। আমি গাড়ীতেই ভুট্টোকে বলি আমাদের এমন একটি সংবিধান রচনা করা উচিত বাংলাদেশের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষা সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে। আর সর্বসম্মতিক্রমে তা যদি না করা হয়, তাহলে সামরিক শাসনের বেড়া জাল থেকে পাকিস্তান কোন দিন মুক্তি পাবে না। আমার কথায় প্রচলিত ইস্তিত ছিল যে, সংবিধান রচনায় আমাদের সাথে সহযোগীতা না করলে ভুট্টোর কোন লাভ হবে না।

বরং সামরিক জাহাজই বেশী সুবিধা হবে। আমার কথার জবাবে ভুট্টো একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন। তিনি বলেন, “ডেন্ট ফরগেট আমীর-উল-ইসলাম, দ্যাট আই গেট লারজেস্ট নাম্বার অব ভোটস ইন দি ক্যান্টনমেন্ট”। এই একটি কথায় বুঝে নিতে আমার অসুবিধা হয়নি যে, পাকিস্তানের সামরিক জাহাজের সাথে ভুট্টোর সম্পর্ক নিবিড়। অন্যান্য দিনের মত ভুট্টো সেদিন হোটеле না গিয়ে তখনকার গভর্নর হাউসে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি তাকে সেখানে নামিয়ে দেয়ার সময় দেখলাম, সিঁড়ির নিচে গভর্নরের এডিসি ভুট্টোর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ভুট্টোকে বলেন, জেনারেল আকবর ফোনে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এ দুটো ঘটনা আমার মনে আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহের স্পষ্ট করে। ফিরে এসে আমি বঙ্গবন্ধুকে এই ঘটনা জানাই। ৩১শে জানুয়ারী ভুট্টো সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাবার কালে ভুট্টো বলে যান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান তৈরী করা হবে। কিন্তু করাচী ফিরে ভুট্টোর সুর বদলে যায়। তিনি বলতে থাকেন সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান চাপিয়ে দেয়ার এখতিয়ার আওয়ামী লীগের নেই। আসন্ন গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি নিজেও যোগ দেবেন না এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্য কাউকে যোগ দিতে দিবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তিনি সামরিক জাহাজের জেনারেলদের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছা নেই। কেন না তারা বুঝতে পারে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সামরিক জাহাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আর এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র জেনারেলদের সাথে গোপনে ভুট্টোও হাত মিলান।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের দ্বিতীয় দফা ও শেষ প্রচেষ্টা ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা। পহেলা মার্চ সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে রচনাকারী কমিটির পক্ষ থেকে খসড়া সংবিধান পেশ করা হয়। এই বৈঠকে পাঞ্জাবের মালিক সরফরাজসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা উস্থিত ছিলেন। আমার প্রণীত খসড়া সংবিধান কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এই ব্যাপারে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু সংসদীয় দলের উপর ন্যাস্ত করেন।

সকালের বৈঠকের পর হোটেল পূর্বাণীতে বিকালের বৈঠকের স্থান ধার্য করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত এক বিবৃতিতে ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। বিক্ষুব্ধ করার জন্য এই একটি ঘোষণা যথেষ্ট ছিল বাংলার মানুষকে ঢাকা শহরের সকল শ্রেণীর মানুষ এই ঘোষণার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। জনতার জোয়ারে ভেসে যায় ঢাকার প্রতিটি অলিগলি, রাজপথ। মিছিলকারী জনতার হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের লাঠি ও লোহার রড। জনতার মুখে একটি স্লোগানই শোনা যায়, বীরবাহাদুরী-অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। ‘৬ দফা, না এক দফা? এক দফা-এক দফা’। সারা শহর থেকে খন্ড খন্ড মিছিল পল্টন ময়দানে এসে জমায়েত হয়। পল্টনের সভায় বক্তৃতা করেন তোফায়েল আহমেদ, নুরে আলম সিদ্দিকী, আ,স,ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আব্দুল মান্নান প্রমুখ। এই সভায় ডঃ কামাল হোসেন ও আমি উপস্থিত ছিলাম। জনতা সেই মুহূর্তে

বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি কামনা করছিল। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও সংসদ সদস্যরা হোটেল পূর্বাণীতে উপস্থিত হয়েছেন।

বেলা সারে চারটায় হোটেল আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমরা যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে পূর্ণ দিবস হরতাল পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় তিনি ভবিষ্যত কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা কালে হোটেল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামীলীগ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যত কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সর্বসময় ক্ষমতা দেয়া হয়। তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে। ২রা মার্চ থেকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি ঠিক করার জন্য প্রতিদিন এই বৈঠক বসে। বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং এ,এইচ কামরুজ্জামানকে নিয়ে দলীয় হাই কমান্ড গঠন করা হয়। তাজউদ্দিন আহমেদকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাকে সাহায্য করার জন্য ডঃ কামাল হোসেন এবং আমাকে বলা হয়।

কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রাম কমিটি গঠনের জন্য সকল জেলা, মহকুমা ও থানাকে নির্দেশ দেয়া হয়। আমার দায়িত্ব ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় সকল জেলার সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য মন্তব্য জেলার সর্বশেষ সার্বিক পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করা। তাছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও আমার উপর ছিল। ব্যাংক কর্মচারী, ডাক, তার, টেলিফোন বিভাগের কর্মচারীদের সাথে আমরা যোগাযোগ করি। তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ডঃ কামাল হোসেন ও আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরী করতাম। এ সব বৈঠক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হতো। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ছিল তাজউদ্দিন আহমেদের। মাঝে মধ্যে ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। টেলিফোন বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব নুরুল হক সাহেব তখন খুবই সহযোগীতা করেন (তাকে পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের রাতে হত্যা করে) তার সহযোগীতায় পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রকার টেলিগ্রাফ, তার বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধুমাত্র বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কথায় টেলিগ্রাফ সুবিধা দেয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমরা তিনজন উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা খসড়া তৈরী করে রাত ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধুর সাথে উদ্ভূত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও জটিলতা থাকলে বঙ্গবন্ধু তার সমাধান দিতেন। এরপর সংবাদপত্রে যা দেয়ার তা দিয়ে দেয়া হতো। নতুন কোন সিদ্ধান্ত থাকলে জেলা সংগ্রাম কমিটিকে জানিয়ে দেয়া হতো। সে সময় চট্টগ্রাম এবং খুলনা আন্দোলনের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম, আর সিদ্দিকী, এম,এ হাল্লান, আব্দুল মান্নান প্রমুখ এবং খুলনা থেকে শেখ আব্দুল আজিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা

করতেন। ঢাকা শহরের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখা হয়। তাছাড়া জনগণের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের লাইব্রেরী কক্ষটিকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এখানে থাকতেন। তাজউদ্দিন আহমেদ নীতি নির্ধারণী হাই কমান্ডের বৈঠকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন বলে অফিসের দায়িত্ব বেশির ভাগ সময় আমাকে পালন করতে হতো। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের লোক নানা সমস্যা নিয়ে এখানে ছুটে আসতেন। সারাদিন ধরে বাজতো টেলিফোনগুলোর সঠিক সমাধানের দায়িত্ব ছিল কন্ট্রোল রুমের। বাসভবনের নিচের কক্ষটিতে টেলিফোন ও কাগজপত্র নিয়ে আমরা কাজ করতাম। হাই কমান্ডের অধিকাংশ বৈঠক হত বঙ্গবন্ধুর কক্ষে। বাড়ীর প্রাঙ্গণে সর্বদাই থাকতো অগণিত উৎফুল্ল জনতার বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের ভিড়।

বঙ্গবন্ধুর ১লা মার্চের আহবানে ২রা মার্চ থেকে সারা দেশে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৩রা মার্চ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু তার বক্তৃতায় দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা টেক্স বন্ধ রাখার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সংগীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া সেদিনের সভা মঞ্চে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাও দেখা যায়। ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। বাংলার মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র আন্দোলন দানা বেধে উঠে। এদিকে বিভিন্ন স্থানে সামরিক জাঙ্গার গুলিতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চে বলেছিলেন ৭ মার্চের রেসকোর্সের জনসভায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সাংবাদিক বাংলাদেশে আসেন। ধানমন্ডির ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর ৬৭৭নং বাড়ী সংগ্রামের সূতিকাগারে পরিনত হয়। সকালে বিকালে দেশী-বিদেশী সাংবাদিক এই বাড়ীতে এসে ভীড় জমান। তারা সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে বিভিন্নভাবে আন্দোলন ও ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে চান। শোনা যায় রেসকোর্সের জনসভাকে লক্ষ্য করে ঢাকা সেনানিবাসে কামান বসানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাহলে জনসভায় গোলাবর্ষন করা হবে।

ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করলাম বঙ্গবন্ধু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন। সারা দেশের মানুষের প্রাণ ঢালা ভালবাসা ও সমর্থন তাকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে। তখন তার প্রতিটি কথা ছিল বাঙ্গালীর মনের কথা।

বঙ্গবন্ধুর মনের কথা তাজউদ্দিন আহমেদের জানা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ইস্তিহাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের খসড়া আমরা রচনা করে দিতাম। নেতার নির্দেশ অনুযায়ী তা করা হতো। আমি পড়তাম আর তাজউদ্দিন

আহমেদ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত মুখে রেখে কান পেতে কথাগুলো শুনতেন। একজন নিখুঁত শিল্পীর মত আমার রচিত খসড়াগুলো তিনি মনযোগ দিয়ে শুনতেন। এরপর তিনি বক্তব্যের খসড়া বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যেতেন। আমাদের রচিত খসড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর পছন্দ হতো। কোন কোন সময় তিনি কিছু পরিবর্তন করতেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার পর বক্তব্যের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে সর্বসময় ক্ষমতা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে খসড়া বক্তব্য লেখার জন্য নির্দেশ দেন। ৭ই মার্চ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে রেসকোর্স ময়দানে মন্ত্র মুন্সের মত তার বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি সেদিন তার বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির পথ নির্দেশ করেন। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ, ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে তিনি একটি ইতিহাস আবৃত্তি করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, নির্যাতন ও নিষ্পেষনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতিকে মরণপণ যুদ্ধের প্রস্তুতির আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির বানী শুনান। বক্তৃতা একদিকে যেমন আবেগময়ী অন্যদিকে ছিল নির্ভুল যুক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী।

প্রকৃত পক্ষে ১লা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়। বক্তৃতার পর বঙ্গবন্ধু বলেন আমি স্বাধীনতার ডাক দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এখন দেশবাসীর দায়িত্ব হল হানাদার বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। বাংলার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিপাগল মানুষ সে দায়িত্ব পালন করেছে। ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয়ের মাধ্যমে এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে এদেশের মুক্তি পাগল মানুষ।

কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতাকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের বক্তৃতার সাথে তুলনা করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে ৭ই মার্চের আগে ও পরে অসংখ্য বক্তৃতা করে গেছেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতার সাথে তার অন্য কোন বক্তৃতার তুলনা হয় কি? মুক্তিযুদ্ধকালে ৭ই মার্চের বক্তৃতায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ছে। তাই আমি মনে করি ৭ই মার্চের বক্তৃতা এক অনন্য বক্তৃতা, যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন বক্তৃতারই তুলনা চলে না। তাই বাঙ্গালী জাতি যতদিন বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে ততদিনই এই বক্তৃতার দ্বারা আলোড়িত হবে। বাঙ্গালী জাতির জীবনে এই বক্তৃতা অক্ষয় ও অম্লান হয়ে থাকবে।

৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নয়া কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দেশে সর্বত্র শহরে বন্দরে নগরে গ্রামে গঞ্জে পাক হানাদার বাহিনীল বিরুদ্ধে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৫ই মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ ৩৫টি নির্দেশ জারী করা হয়। এই নির্দেশের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ই মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এ দিন সকালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মতামত ব্যক্ত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠকে উপস্থিত দুই একজন ছাড়া সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পাক সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা সশস্ত্র ভাবেই করতে হবে। এই বৈঠকে অন্য একটি বিষয়

নিয়ে আলোচনা হয় সেটা হলো, এই পরিস্থিতিতে আমরা বিদেশের কাছ থেকে কি রকম সাড়া বা সাহায্য পতে পারি।

আমি এ বৈঠকে আমার বক্তব্য তুলে ধরি। চার্চিলের 'উই আর এলোন অন দ্যা ব্রীজ' এই উদ্ধৃতি দিয়েই বক্তৃতা শুরু করি। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। ৭০ এর ১২ই নভেম্বরের ঘুনী ঝড়ের পর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন করতে থাকে। তারপর জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয় সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ঐতিহাসিক আন্দোলনের খবর বহিঃবিশ্বের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিদেশের কোন সরকার বা উচ্চ পর্যায়ের লবির সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না আমার। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে তুলনায় আমাদের বলতে গেলে কোন যোগাযোগই ছিল না। আমার বক্তৃতার পর তাজউদ্দিন আহমেদ বক্তৃতা করেন। তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করে কর্তব্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও জনগণের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সংগ্রামকে গণভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। সভাপতির ভাষনে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলায় সকলকে প্রস্তুত থাকার ইঙ্গিত দেন।

এদিকে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার সহকর্মীদের সাথে বঙ্গবন্ধু ও তার সহকর্মীদের আলোচনা অব্যাহত থাকে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে সংবিধানের খসড়া পেশ করা হয়। এই খসড়াটির মূল অংশগুলো মেনে নেয়া হবে। প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এ ধরনের ধারণা দেয়া হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার কথা পরবর্তী বৈঠকে। ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্টের পক্ষ নিরব থাকে এবং সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন শুরু করে। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেয়ে গেছি যে, প্রত্যহ বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে আমরা খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'সোয়াত' জাহাজে করে অস্ত্র এসেছে। বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করেন। খবরটি ছিলো 'সোয়াত' জাহাজ থেকে যেন অস্ত্র নামাতে না দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মেজর জিয়া কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন না করায় পরবর্তীকালে তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা হয়নি। ২৩শে মার্চ সকাল ঢাকা থেকে সকল জেলা সদরে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করা হয়। নির্দেশে বলা হয়, যে কোন সময় পাক বাহিনী আমাদের উপর হামলা চালাতে পারে। পাল্টা আঘাত হানার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশের পতাকা ইতিমধ্যেই দেশের সর্বত্র তৈরী হয়ে গেছে। ২৪শে মার্চ বিকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু সকলকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু তার পিছনের ঘরে প্রায় প্রত্যেকের সাথে ১ মিনিট করে কথা বলেন। অনেক সময় ভীড়ের মধ্যে বাথরুমেরও কারও কার সাথে কথা বলেন। ২৫শে মার্চ মার্চ

তারিখেও এ ধরনের শলা পরামর্শ চলে। বঙ্গবন্ধু একে একে সকলকে বিদায় দিচ্ছেন। বিকাল থেকেই যেন ৩২নং এর বাড়ীতে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। বিকাল প্রায় ৪টায় আমার বন্ধু তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব দিলদার রিজভী বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। কথা বলার সময় আছে কিনা। সময় থাকলে তার সাথে চা খেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। রিজভীর বাসা বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে ২০০ গজ দূরে। আমি রিজভীর সাথে তার বাসায় গেলাম। রিজভী আমাকে বলেন, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এদেশ বসবাসের কোন যোগ্য থাকবে না। তিনি তখনই জ্বীপুত্র নিয়ে সেনানিবাসে তার ভগ্নিপতির বাসায় চলে যাচ্ছেন। রিজভী তার পাঠান দারোয়ানের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমি কোন সময় গেলে যেন আমাকে থাকার আশ্রয় দেয়া হয়। তিনি বলেন ইচ্ছা করলে আমি তার বাড়ী ব্যবহার করতে পারি। পেছনের একটি দরজা দেখিয়ে বলেন বিপদের সময় পলায়নের রাস্তা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম শহিদুল্লাহ কায়সার কিছুদিন এই বাড়ীতে ছিলেন। (বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফিরে এসে তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো শেষ করি। রিজভীর কাছে শোনা বক্তব্য এক ফাকে বঙ্গবন্ধুকে জানাই। শুনে গম্ভীর হয়ে যান।

এর ক’দিন পূর্বে এ রকম আত্মগোপনের কথা নিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে পরবর্তী পরিস্থিতিতে আত্মগোপনের জন্য চাপ দেই। তিনি আত্মগোপন করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, আত্মগোপনের জন্য তিনি পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুকে বলে আসছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। বঙ্গবন্ধু একদিন তার বেডরুমে হাইকমান্ডের বৈঠকের সময় তাজউদ্দিন আহমেদ ও আমাকে ডাকেন। আমি আমার সহ হুইপ আব্দুল মান্নানকে নিয়ে যাই। বৈঠকে আত্মগোপনের জন্য আমরা সকলে মিলে বঙ্গবন্ধু চাপ দেই। তিনি প্রশ্ন করেন আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন সম্ভব নয়, আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। ২৫শে মার্চ বিকালে আমার আবার ইচ্ছা হলো আত্মগোপন করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ জানাই। মনে মনে ঠিক করলাম তাজউদ্দিন আহমেদ ও ডঃ কামাল হোসেন আসলে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় শেষ অনুরোধ জানাব। তারা দুজন অন্য কাজে বাইরে ছিলেন। আমি জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর শেষ বক্তব্যের খসড়া তৈরী করতে ব্যস্ত। আমার খসড়া প্রস্তুত হলো। বঙ্গবন্ধু একটু দেখে ঠিক করে দেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সামনে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। আমি বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে পাশে বদরুল্লাহ আহমদের বাসায় খোঁজ নিতে যাই। নুরুদ্দিন ভাই বলেন, সেনানিবাস থেকে শীগগীরই ট্যাংক বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জনতার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি তিনি ওপরে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে আবার বেরিয়ে আসি। আমি এখন আশা করছি তাজউদ্দিন আহমেদ ও কামাল হোসেন কে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ আলোচনা করব। তাজউদ্দিন আহমেদ ও কামাল হোসেন কে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ আলোচনা করব। তাজউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে দেখি বেগম নূরজাহান মোর্শেদ এমপি বসে আছেন। বাড়ীর ভিতরে তাজউদ্দিন

ভাই জোরে জোরে ভাবীর সাথে কথা বলছেন। কথা শুনে বুঝলাম তাজউদ্দিন ভাইয়ের মন খারাপ। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। উদ্দেশ্য কামাল হোসেনের সাথে দেখা করা। গাড়ীতে নূর জাহান মোর্শেদ কে নিয়ে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তার বাসায় নামিয়ে দিতে যেয়ে তাকে বললাম, আজ রাতটা বড় খারাপ। তাকে নামিয়ে আমার বাসায় আসার পথে দেখি পাক সৈন্যরা বেতার ভবন দখল করে নিয়েছে। সার্কিট হাউজ রোডের ৪ নম্বর বাড়ীতে আমি থাকি। কামাল হোসেন থাকেন ৩ নম্বর বাড়ীতে। আমার বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে কামাল হোসেনের বাড়ী যাই। তিনি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আহমেদুল কবীর ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায়ের সময় লম্বা না করার জন্য আমি তাদের তাড়া দিলাম। তাদের বিদায় দিয়ে ডঃ কামাল কি করা যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বললাম, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি প্রস্তুত হোন। আমি বাসায় লীলাকে বলে আসি।

১লা মার্চ থেকে বাড়ীতে দুপুরে খাওয়ার সময় আসি। স্ত্রী ও পুত্র কন্যার সাথে এক প্রকার কথাবার্তা হয়না বললেই চলে। আমার স্বপ্নের আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব এম, ওসমান আলী ১৯শে মার্চ ইন্তেকাল করেন। স্ত্রী তখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পিতৃহারা স্ত্রীকে স্বাধুনা দেয়ার সময়ও আমার হয়ে ওঠেনি। ঘরে প্রবেশ করে লীলাকে বললাম, আমাকে এখন চলে যেতে হবে। সে শুধু জানতে চাইল আমার কাছে টাকা আছে কি না। পকেটে ২/১০ টাকা থাকতে পারে। আমার পড়নে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবী, আর পায়ে সেভেল। 'ভাল থাকো'। এ কথা বলে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পূর্বের মত দেয়াল উপকিয়ে বাসা থেকে বেড়িয়ে কামাল হোসেনের বাসায় আসি। তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পথে দেখি শাহবাগের মোড়ে জনতা গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। এই পথে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। বহু কষ্টে কর্মীদের সহযোগিতায় রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আমরা পৌঁছি। বঙ্গবন্ধু যে আত্মগোপন করতে নারাজ গাড়ীতে ডঃ কামালকে সে কথা জানাই। ৩২ নম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখি বঙ্গবন্ধু নীচের তলায় খাবার শেষ করছেন। দৃশ্যটি দেখে আমার 'লাস্ট সাপারের' কথা মনে পড়লো। বঙ্গবন্ধুর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে গেঞ্জী ছিল। আমাদের দুজনকে দেখে তিনি দরজায় আসেন। আমরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাই। বঙ্গবন্ধু তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা পাঠ করেছে, আমি যা নির্দেশ করবো, তাই শুনবে। তারপর তিনি আমাদের দুজনের পিঠে দু'হাত রেখে বলেন, 'কামাল, আমীর-উল আমি কোন দিন তোমাদেরকে আদেশ করিনি। আমি তোমাদের আজ আদেশ করছি, এ মুহূর্তে তোমরা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আর তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করবে'। আর শহরের অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন, আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে। তিনি বলেন, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে হানাদাররা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক এটা আমি চাইনা। বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে সাতমসজিদ রোডে মোহাম্মদ মুসা সাহেবের বাড়ীতে যাই। আমার

গাড়ী সেই বাড়ীতে রেখে মুসা সাহেবের গাড়ীতে উঠি। মুসা সাহেবের গাড়ী ড্রাইভার চালায়। আমরা তাজউদ্দিন আহমেদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। তাজউদ্দিন ভাইকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। তাকে জানাই, বঙ্গবন্ধু সকলকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইতস্তত করেন। এ সময় বিডিআর এর একজন হাবিলদার এসে আমাদের বলে গেলেন, বিডিআর সকল বাঙ্গালী সদস্যরা বেরিয়ে পড়েছে। আজ রাতে তারা পাক বাহিনীর হামলার আশংকা করছে। তাজউদ্দিন ভাইকে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বললাম। তিনি ভেতরে গেলেন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ডঃ কামালকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ডঃ কামাল গাড়ী যোগে অন্যত্র যেতে চাইলেন। আমি বললাম, এটা ঠিক হবে না। তাজউদ্দিন আহমেদের কিছুটা দেরী হলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। তার পরনে লুঙ্গি পায়ে পাঞ্জাবী। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। আর তার ঘাড়ে একটি রাইফেল। তার এই বেশ দেখে আমি বললাম, শিকারে যাচ্ছেন নাকি?

তাজউদ্দিন ভাই গত কিছুদিন যাবৎ আমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা বলছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই রাইফেল ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছেন। আরহাম সিদ্দিকী তাকে এই রাইফেল যোগাড় করে দেন। কিন্তু এই রাইফেল পরবর্তীকালে আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাইফেল বেশী দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এই এলাকায় পাক সৈন্য এসে যাবে। পুরাতন ঢাকার একটি বাড়ীতে সকলের একত্রিত হবার কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার বাসভবন থেকে বাইরে আসতে রাজী না হওয়ায় সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ী ছেড়ে না যাবার সিদ্ধান্তে নেতাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাজউদ্দিন আহমদ ভগ্ন মনোরথ অবস্থায় বাড়ীতে বসে ছিলেন। তিনি নিজেকে এক রকম ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আঘাত হানার পূর্বেই আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। এরপর ভাবলাম, ১লা মার্চ থেকে তাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন ও আমি একত্রে কাজ করেছি। এই ৩জনকে যে কোন মূল্যে একত্রে থাকতে হবে। ১৫ নম্বর সড়কের কাছাকাছি এলে ডঃ কামাল গাড়ী থামাতে বলেন। তিনি বলেন, সকলে এক বাড়ীতে না থেকে আমি এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাই। আমার চরম অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বাধা দিতে পারলাম না। তবে মনে মনে খুবই বিরক্ত হ'লাম। কামাল হোসেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তার একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ধরনটা মেনে নিতে পারলাম না। তবুও কামাল হোসেন গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। কথা রইলো পরদিন সুযোগ পেলেই তিনি মুসা সাহেবের বাড়ীতে যাবেন। আমরাও সেখানে যাব, না হয় যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নেব কিন্তু এটা আর হয়ে ওঠেনি। ডঃ কামাল মুসা সাহেবের বাড়ী যেতে পারেননি, আর আমরাও পারিনি ডঃ কামালের সাথে যোগাযোগ করতে। পরবর্তীকালে তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। নির্যাতিত হন পাকিস্তানী কারাগারে। আর আমরা বঞ্চিত হই তার সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে ডঃ কামালের সেদিনের একক সিদ্ধান্ত আজও আমাকে পীড়া দেয়। যদিও তিনি পাকিস্তানী কারাগার থেকে ফিরে না এসেছেন, তবুও তিনি নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়েছে। কেন সেদিন জোরে বাধা দিতে পারিনি।

ইতিমধ্যে ধানমন্ডির বিদ্যুৎ চলে গেলো। রাত্তা জনমানবশূন্য। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের দুই-একটা পাড়ী মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোর মত দেখা যায়। কাল বিলম্ব না করে লালমাটিয়ার রেলওয়ের এক কালের চীফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়ীর কাছে গিয়ে দু'জন নেমে গেলাম। ড্রাইভার পাড়ী নিয়ে মুসা সাহেবের বাড়ী চলে গেলো।

গফুর সাহেব আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা তাকে পূর্বে কোন খবর দেইনি। তবুও তিনি আমাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেন। আমরা বাড়ীতে ঢুকার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই এক প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত ঢাকা শহর কেঁপে উঠলো। পরে জেনেছি এটা ছিল আঘাত শুরু করার সংকেত।

তরু হলো চারিদিক থেকে ত্রাশ ফায়ার। অবস্থা জানতে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই বাড়ীর ছানে যাই। পাকবাহিনীর ব্যাপক হামলার মাঝে আমাদের ছেলেদের ৩০৩ রাইফেলের বিচ্ছিন্ন শব্দ। 'জয় বাংলা' ধ্বনি তনতে পাই। পাশাপাশি মোহাম্মদপুরের কয়েকটি বাড়ী থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গেল। আমরা মোহাম্মদপুরের এলাকার কাছাকাছি ছিলাম। তবে একদিক থেকে আমাদের বাড়ী নিরাপদ মনে হলো। কেননা অবাঙ্গালী অধ্যুষিত মোহাম্মদপুর এলাকায় পাক বাহিনী কোন হামলা করবে না। আক্রমণের ব্যাপকতা ও আকস্মিকতায় একেবারে 'থ' হয়ে গেছি।

আমাদের উপর হামলা হবে একথা জানতাম। সেটা হবে রাজনীতিবিদ, ছাত্র ও কর্মীদের ওপর। কিন্তু আধুনিক সময় সজ্জায় সজ্জিত পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর বর্বরভাবে ঝাপিয়ে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। পৃথিবীর ইতিহাস এ ধরনের নজীর আর কোথাও দেখিনি। গফুর সাহেবের বাড়ীর অসম্পূর্ণ ছাদের ইট, তরকারী উপর বসে আমরা দু'জন পাকইসনাদের হামলার মুখে ভয়াবহ মানুষের আতঙ্কিতকার তনছি। এক সময় তীব্র নীলাভ এক উজ্জ্বল আলোতে ঢাকা শহর আলোকিত হয়ে উঠল। বিভিন্ন স্থানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের কাণ্ডাধোয়ার ঢাকার আকাশ ত্রমশই কাণ্ডা হয়ে উঠেছে। মধ্যরাতের দিকে ত্রাশ ফায়ার ও বিকট শব্দ শুনে তাজউদ্দিন আহমদ বলে ওঠেন, এবার দস্যুরা ৩২ নম্বার বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে হামলা করছে। এ সময় তিনি কেঁদে উঠলেন। বঙ্গবন্ধু কি তার বাসা থেকে বেরিয়েছেন? বঙ্গবন্ধু যখন কোন অবস্থাতেই বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে অসম্মত হন, তখন আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ ছিল, তার বাড়ীর পেছনে জাপানীদের অফিসে যেন তিনি চলে যান। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কথা, তার পরিবার পরিজনদের কথা, দলের বিভিন্ন নেতার কথা বার বার মনে হতে লাগলো।

এক সময় আমরা দুইজন ছান থেকে নেমে এলাম। নীচে এসে অনকক্ষণ বসে রইলাম। শুধু ভাবছি আর ভাবছি। এমনিভাবে রাত ভোর হতে চলল। চারদিক থেকে গুলীর শব্দ আসছে। শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে উঠেছে।

সকালে আমি বাথরুমে গেলাম। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। মনে হলো এক রাতে একটা শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

পাশে পড়ে ছিল গফুর সাহেবের রোড। ১৯৬১ সালে লন্ডনে ব্যারিস্টারী পরিষ্কার সময় সযত্নে রক্ষিত ফ্রেঙ্ককাট দাঁড়ি কেটে নিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর

পরদিন ঘুম থেকে ওঠে লক্ষ্য করলাম, কার্ফু ও গোলাগুলির মধ্যেও সাধারণ মানুষের গতি অব্যাহত রয়েছে। সামনে রাজপথ দিয়ে লোকজনের চলাচল নেই। কিন্তু ভিতরের রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করছে। ছোট ছোট ছাপড়া দোকানগুলোর ঝাপ উঠিয়ে সওদা বিক্রয় করছে। কাজের মেয়েরা কলসী দিয়ে পানি নিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলে আমার চলাচলেও কোন অসুবিধা হবে না।

আমি একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। যে কোন ভাবে সাত মসজিদ রোড পার হতে হবে। আমার অবস্থান থেকে সাত মসজিদ রোড বেশ দূরে। আমার খুবই পরিচিত কুষ্টিয়ার আতাউল হক স্বপরিবারে সাত মসজিদ রোডের কাছাকাছি থাকেন। গলি দিয়ে পার হচ্ছি। পথে একজন মৌলানাকে পেলাম। এমনতেই তার সাথে কথা বলি। তিনি লালমাটিয়ার পুরাতন অধিবাসী। মৌলানা সাহেব আতাউল হককে চিনেন। তার সাহায্যে আতাউল হকের বাড়ীতে পৌছি। মৌলানাকে বললাম, আমি হক সাহেবের আত্মীয়, পাবনা থেকে এসেছি। ওরা আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি। পরে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। মৌলানাকে ঐ বাড়ীতে আমার আত্মীয় মহম্মদ আলী আছেন, তাকে নিয়ে আসার জন্য বললাম। কিছুক্ষণ পর মহম্মদ আলী এসে হাজির হলেন।

হক সাহেবের বাড়ীতে আমাদের নাশতা তৈরী করতে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি। বিভিন্ন বাড়ীর পেছনের অলিগলি দিয়ে পথ চলছি। আমার আশংকা হচ্ছিল এই বাড়ী থেকে বেরোতে না পারলে, অটিকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন স্থানে হামাগুড়ি দিয়ে সাত মসজিদ রোডে পৌঁছার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে একটি মিলিটারী জীপ এই রাস্তায় ঢুকে পড়ে, রাস্তায় ঢুকেই ওরা এলোপাথারি গুলি ছুড়ে। আমি একটি বাড়ীর পাশে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। জীপটি ফিরে যেতেই আমি আতাউল হকের বাড়ীতে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর এ ধরনের গোলাগুলী চরম আকার ধারণ করে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বলছে। ভয়াবহ মানুষের আতর্জিতকারে পরিবেশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

আতাউল হকের ঘরের বেড়া ও চাল টিন দিয়ে তৈরী। টিনের বেড়া ফুটো করে গুলী যে কোন একজনের গায়ে লাগতে পারে। গৃহকর্ত্তী বলেন, পাশের পাকা বাড়ীতে চাকর ছাড়া অন্য কোন লোকজন নেই। আমরা ইচ্ছা করলে দেয়াল টপকে সেখানে যেতে পারি। তার কথায় আমি পাশের বাড়ীতে যাই। তাজউদ্দিন, ভাই ঐ বাড়ীতে গেলেন না।

এলোপাথারি গুলি প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে। পরে শুনেছি, এটা ছিল প্রথম পর্যায়ের অপারেশন। পাক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশকে আতংকিত করে ঢাকা বাসীকে গ্রামের দিকে ঠেলে দেয়া। বস্তি এলাকা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আতাউল হকের নির্মাণাধীন বাড়ীর ভেতরে খোলা আকাশের নীচে বস্তির বহু লোক আশ্রয় নিয়েছে। ছিন্নমূল মানুষ সামান্য আসবাবপত্র ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে এসেছে এখানে। কার্ফু জারী থাকা অবস্থায়ও এলোপাথারি গুলি চলে। এমন সময় একটি মাইকে কেউ বলে গেল, কিছুক্ষণের জন্যে কার্ফু তুলে নেয়া হয়েছে।

সে সময় একজন ছাত্র বাড়ীতে আসে। সে আমাদেরকে চিনতে পারে। তার মুখে শহরের টুকতো টুকরো খবর পেলাম। আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল ৩২ নম্বর বাড়ীতে কি হয়েছে? ছাত্রটি সঠিক কিছু বলতে পারলোনা। তবে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে দু'ধরনের খবর শুনেছে। কেউ বলছে বঙ্গবন্ধু সরে গেছেন। আবার কেউ বলেছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাইরে কার্কু না থাকায় আমরা বাড়ী ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের দু'জনের হাতে ১টি করে বাজারের থলি। যেন আমরা বাজার করতে যাচ্ছি। তাজউদ্দিন ভাইয়ের পড়নে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা টুপি। বাজারের থলির নীচে তার নিজের ব্যাগ রাখা হয়েছে।

আমরা সাত মসজিদ রোডে পৌছি। আর একটু এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিলে ১৯ নম্বর রাস্তা। সেটা পার হলেই রায়ের বাজার। এমন সময় আমাদের পেছনে একটি মিলিটারী জীপ এলো। জীপটি চলে যেতেই আমরা আবার রাস্তায় চলে আসি। ডানে মোড় নিলে লালমাটিয়ার সীমানা পেড়িয়ে ১৯ নম্বর সড়ক। ডানে মোড় নিব এসময় তাজউদ্দিন ভাই থমকে দাড়ান। আর একটু এগুলেই ডান পাশে তার বাড়ী। তাজউদ্দিন সাহেব তার বাড়ী যেতে চাইলেন। আমি জোর আপত্তি জানাই। যুক্তি দিলাম, আপনার বাড়ী নিশ্চয়ই আক্রান্ত হয়েছিল। হায়েনার দল এখনো বাড়ীর আশেপাশে আড়ি পতে বসে থাকতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই-এর মনে পড়ল তার ওষুধগুলোর কথা। সেগুলো বাড়ীতে রয়ে গেছে। বাড়ীতে আর যাওয়া হলো না।

ডান দিকে মোড় নিয়ে আমরা রায়ের বাজার পৌছি। এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি শক্ত ঘাঁটি তখনো রয়েছে। নির্ভীক কর্মীরা সংগ্রাম কমিটির অফিস পাহারা দিচ্ছে। এদের সাহস দেখে একদিকে যেমন বিস্মিত হলাম, অপর দিকে আমার হাসিও পেল। কেননা প্রবল প্রতিপক্ষ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মোকাবেলা সাহসের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও কৌশলের দিক দিয়ে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পাক বাহিনীর হামলা তখনো আসেনি। এলাকাসীরা মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও অন্যান্য নেতা কর্মীদের সাথে আমাদের কথা হলো। তারা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে করণীয় জানতে চাইল। আমরা সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি নির্দেশ দেই।

রায়ের বাজার থেকে দু'জন লোককে দু'দিকে পাঠালাম। একজন গেল ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর খোঁজ খবর জানতে, আর অপরজনকে পাঠালাম মুসা সাহেবের বাসায় ডঃ কামাল এসেছেন কিনা তা জানার জন্য। ৩২ নম্বরের খোঁজ নিয়ে আমাদের প্রেরিত লোক ফিরে এসে জানায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে পুলিশ নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন লোকজন নেই। পরস্পর জানতে পেরেছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। আর মুসা সাহেবের বাড়ীতে খোঁজ করে জানা গেল, ডঃ কামাল হোসেন সেখানে পৌছাতে সমর্থ হননি।

সংগ্রাম কমিটির এই অফিসে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে খবর আসছে মানুষের মুখে খবর প্রচার হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সুত্রে, জানা গেল শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, প্রমুখ নদী পার হয়ে জিনজিরার দিকে চলে গেছেন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কোন খোঁজ খবর জানতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করব। সেখানে উপস্থিত নেতা কর্মীদের বললাম, সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেরিয়েছি। তারা সময়ে সময়ে নির্দেশ পাবে।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক ভেবেছি। পাক বাহিনীর নগ্ন হামলার জবাব দিতে হবে। বাংলার দামাল যুবকদের পুনর্গঠিত করতে হবে। ২৭শে মার্চ রায়ের বাজারের একদল কর্মীদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। এই বিদায় ছিল মর্মস্পর্শী। তাজউদ্দিন ভাইকে আমি বলি, এখন পথই আমাদের ঠিকানা, পথই আমাদের সঠিক পথে পৌঁছে দেবে। বিদায়ের সময় রায়ের বাজারের একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করেন আমাদের পরিবারের জন্য কিছু বলার আছে কিনা? আমরা দু'জন দু'টুকরো কাগজ নিয়ে কিছু লিখে তাদের হাতে দিলাম। কর্মীরা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। তাজউদ্দিন ভাইয়েরটা পৌঁছুল, আমারটা কর্মীরা পৌঁছাতে পারেনি। শুনেছি আমার বাড়ীওয়ালী কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দেননি। আমার খোঁজে কেউ আসলে তাকে ভয় দেখাতেন।

পরবর্তীকালে দু'জনে আলাপ করে দেখেছি স্ত্রীর কাছে আমাদের দু'জনার লেখার মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল ছিল। আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছি। কবে এর শেষ হবে জানি না। আট কোটি মানুষের সাথে মিশে যাও। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে দেখা হবে।

আমরা আবার যাত্রা করি। তাজউদ্দিন আহমদের পায়ে কাপড়ের জুতো। হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। জুতা খুলে তিনি হাঁটতে থাকেন।

আমরা রায়ের বাজার থেকে নদী পার হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় যাব। অগণিত লোক পার হয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে হেঁটে চলেছি। ঢাকা থেকে ভাগ্যাহত মানুষ যাচ্ছে। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। পাক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে লোকজন ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মানুষের মিছিলে সব শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এই মিছিলে আমরা মিশে গেছি। কেউ জানেনা আমরা কারা। শুধু জানি আমিও ওদের একজন। চলতে চলতে এক সময় হয়তো এক বৃদ্ধার মাথার পুটলিও নিজের হাতে নিয়েছি। কখনো বা কোন ছোট শিশুকে কোলে করে পার করে দিয়েছি।

আমাদের গতি দ্রুত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হাজার হাজার মানুষ উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে চলছে। রাস্তার দু'পাশের গ্রামের মানুষ মিছিলের মানুষকে উদার হস্তে খাওয়াচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে। ভেকে ভেকে মানুষকে খাওয়াচ্ছে। আতিথেয়তার প্রতিযোগীতা ছিল

প্রতিটি গৃহে। সেদিন বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীদের দরদ দেখে ছিলাম। এতে আমি নিশ্চিত হই যে, বাংলার স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চলার পথে একজন সিপাই যুবকের সাথে কথা হলো। তার পরনে লুঙ্গি ২৫শে মার্চ রাতে সে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ছিল। সে রাতে কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলো, কিভাবে তার সঙ্গী সাথীরা পাক বাহিনীর বর্বরতার শিকার হলো, এই ভয়াবহ কাহিনী তার মুখ থেকে শুনলাম। অন্য একজন সিপাই পালিয়ে এসেছে। সে মিটফোর্ড হাসপাতালে একজন রাজবন্দীর পাহারায় ছিল। অতি কষ্টে সে জীবন নিয়ে চলে এসেছে।

কাফেলাতে শুধু জীবন মানুষ নয়, এখানে এসেছে লাশ। কয়েকদিনের পুরনো লাশও রয়েছে। প্রিয়জনের মৃতদেহ ওরা ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে। পথে পথে অনেক জানাজা হতে দেখলাম। ঢাকাতে যারা শহীদ হয়েছে তাদের লাশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

পথিমধ্যে তাজউদ্দিন ভাইকে অনেকে চিনে ফেলেন। একজন আওয়ামী লীগ কর্মী আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও এক প্রকার জোড় করে তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। তার জোর দাবী কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা এক প্রকার ভুলে গেছি। চা ও বিস্কুট খেলাম। কিছু বিস্কুট পকেটে নিয়ে আমরা পথ চলা শুরু করি।

যাবার আগে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলে গেলাম, সংগ্রাম কমিটির আওতায় সবকিছু পরিচালনা করতে হবে। শত্রুদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। শত্রুদের খবর পেলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পথ চলতে চলতে এক সময় বেলা পড়ে গেলো। সামনে একটি নদী এই নদী পার হলে নবাবগঞ্জ থানা পার হয়ে আমরা দোহার থানায় যাব। খেয়া নৌকায় লোকজনকে পার করে দেয়া হচ্ছে। খেয়া নৌকায় লোকজনকে পার করে দেয়া হচ্ছে। তবুও নদীর দু'ধারেই মানুষের ভীড়। তবে মানুষকে পার করে কেউ কোন পয়সা নিচ্ছেনা। আশেপাশের মানুষ নিজেদের নৌকা দিয়ে সবাইকে পার করে দিচ্ছে। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সাথে একটি নৌকায় পার হই। নৌকাওয়ালা পয়সা নিতে রাজী হলো না।

ওপারে নেমেই দেখি একজন যুবক দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে জড়িয়ে ধরল। সে যেন আনন্দে আত্মহারা। যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। সে, বলল, আপনাদের নেয়ার জন্যই আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

মোটর সাইকেলে দুইজনের বেশী ওঠা যায় না। প্রথমে তাজউদ্দিন ভাইকে নিয়ে গেল তার গ্রামে। আমি হাঁটতে থাকি। পরে আমাকেও নিয়ে গেল। সে গায়ে আওয়ামী লীগের এক বিশিষ্ট নেতার বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা ক্ষুধা পিপাসায় কাতার। বাড়ীর সামনে পানি ভরা পুকুর। সন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও দু'জনে পুকুরের পানিতে গোসল করি। এরপর বৈঠকে বসি। ইতিমধ্যে এই বাড়ীতে অনেক লোক জন জমা হয়ে গেছে। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হলো।

আহার শেষে দু'জন এক চৌকিতেই ঘুমাতে যাই। পরদিন ভোরে আমাদের যাবার জন্য ২টি মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের অবস্থান থেকে পদ্মার দূরত্ব ৫০ মাইল। মোটর সাইকেলযোগে রওনা হয়ে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা সুবেদ আলী এম.পি.র বাড়ী পৌছি। সুবেদ আলী টিপু ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেতে গিয়েছিলেন। বিলেতে থাকাকালে তার সাথে আমার পরিচয়। তিনি একজন উৎসাহী দলীয় সদস্য।

এই বাড়ীতে আমরা আবার বৈঠকে বসি। সেখানে কৃষক নেতা জিতেন বাবুর সাথে দেখা হলো। তিনি ন্যাপ এর সদস্য। ঘন্টা খানেক পরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অপর একজন এম.পি এ আশরাফ চৌধুরীর বাড়ীতে পৌঁছে যাই। গৃহস্থামী মাত্র ১ ঘন্টা আগে বাড়ী পৌঁছেছেন। তিনি ২৫শে মার্চের কালো রাতে ঢাকায় ছিলেন। বিরাট দ্বিতল বাড়ী। পানি এনেদানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কিছু খেয়ে আবার পথ চলা শুরু করি। পথ দেখাবার জন্য স্কুলের একজন দফতরী আমাদের সাথে রয়েছেন। পদ্মার তীরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রমত্ত পদ্মার বুকে তখন প্রচণ্ড ঢেউ। কয়েকটি নৌকা তীরে বাধা রয়েছে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কোন নৌকা আমাদের ওপারে নিয়ে যেতে সাহস পেল না। অগত্যা তীর থেকে আমরা আগারগাঁও নামক একটি গ্রামে ফিরে এলাম। আমাদের দলীয় একজন কর্মী বঙ্গুর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি।

বাড়ীর লোকেরা তাঁতের কাজ করে খায়। এান করে খেতে যাব, হঠাৎ স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান কানে ভেসে আসলো। ঘোষক বেতারে বলছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে হাজির হতে বেতারে নির্দেশ দেয়া হলো। প্রথমে এদের নাম ধাম কিছুই বুঝা গেল না। ঠাওর করে উঠতে পারলাম না, কারা কোথেকে এই বেতার চালাচ্ছে। পরে বেতারে মেজর জিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। মেজর জিয়ার আহবান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে। পরদিন এই বেতার থেকে টিফা খানের আহত হবার খবর গুনি। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের অনেক খবর প্রচার করা হয়। আমরা দু'জন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে অবিলম্বে একটি সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পরদিন ভোরবেলা আবার রওয়ানা হই। পদ্মা তখন শান্ত। মাঝ নদীতে চর পড়েছে। আমাদের তাই দুই অংশে পার হতে হবে। আমাদের সাথে আশরাফ আলী চৌধুরীর স্কুলের পিওন রয়েছে। পদ্মার ঘাটে ছোট বড় অনেক নৌকা। অনেক নৌকা খুলনা বরিশালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি এবারে ফসল কেটে সব নৌকা কি ঘরে ফিরতে সমর্থ হবে? এমনভাবে ভাবতে ভাবতেই নদীর পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠছি। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছি। সকলের মনেই ভীতির ভাব। এমন সময় আই ডরিউ টি এর মোটর যান শব্দ করে আমাদের দিকে আসছে। কেউ কেউ এটাকে পাক সামরিক বাহিনীর মোটরযান ভেবে আশংকা প্রকাশ করে। আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ি ওরা ঢাকা ছেড়ে আসতে পারে না। মোটর যানটি কাছে আসার পর দেখা গেল এতে কিছু সাধারণ যাত্রী

রয়েছে। পরে শুনেছি, পাক বাহিনী যাতে ব্যবহার করতে না পারে এ জন্য শ্রমিকরা এই বোটগুলোকে নিয়ে এসেছিল।

আমরা নদীর ওপারের খবর জানি না। সেখানে একটি বাজার দেখা যাচ্ছে। একটি নৌকা করে আমরা নদীর ওপারে যাই। আর নদীর এপার থেকেই আমাদের পথ দেখাতে আসা পিওনকে বিদায় করে দেই। বাজারের পাশেই একটি মাঠ। মাঠে কেউ কেউ লাঙ্গল চালাচ্ছে কেউ বা অন্যান্য কাজ করছে। চারদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হল।

এই অবস্থায় আমরা বাজারে গিয়ে পৌঁছি। বাজারে গিয়ে সেখানকার সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের সাথে দেখা হলো। আমরা এখান থেকে ফরিদপুর যাব। সেখান থেকে পায়ে হেটে ছাড়া অন্য কোন পথে যাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি পায়ে হাটা পথও ভাল নয়। খাল, বিল, নালা পেরিয়ে যেতে হবে। তবে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। অগত্যা আমরা দু'টি ঘোড়া ভাড়া নেই। এই বাজার থেকে ৭ মাইল দূরে ফরিদপুর শহর। ঘোড়ায় চড়ে শহরের এক প্রান্তে নামি। সেখান থেকে রিক্সাযোগে আওয়ামীলীগ নেতা ও এম,পি ইমামউদ্দিনের বাড়ীতে উপস্থিত হই।

বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝলাম লোকজন বেশ শংকিত। গত রাতে শহর থেকে লোকজন গ্রামে চলে গেছে। ঢাকা থেকে লোকজন এসে সেখান ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা দিয়েছে। ঢাকার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কথা শুনেই লোকজন রাতের বেলা শহর থেকে চলে যায়। ইমামউদ্দিনের স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। বাড়ীতে তিনি একা। ইমামউদ্দিন বাড়ীতে নেই, তিনি সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আশে পাশের পুলিশ ও বিডিআর এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে আশংকা করছে এখানে যশোর থেকে পাক সৈন্যরা যে কোন সময় হামলা করতে পারে। আমরা সবেমাত্র খেতে বসেছি। এমন সময় খবর এল পাক সৈন্য এদিকে আসছে। কোন দিক দিয়ে আসছে। সে সময় তা বুঝা গেল না। চারদিক লোকজন ছুটোছুটি করছে। প্রাণ ভয়ে। মনে মনে ঠিক করলাম। এখান থেকে মাগুরার পথে রওয়ানা হবো। সেখান থেকে যশোর সেনানিবাস ও আশে পাশের খবর পাওয়া যাবে। স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে আলোচনা শেষে আমার ফরিদপুর ত্যাগ করি। রাস্তার বিভিন্ন অংশ কেটে দেয়া হয়েছে। পাক সৈন্যের গতি রোধ করার জন্য। একটা রিক্সা-যোগে আমরা কামারখালীর পথে চলেছি। কোথাও কেথাও নিজেরা রিক্সা পার করেছি।

এমন সময় ফরিদপুরের দিকে একটি জীপ আসতে দেখি। জীপটা কার তা দেখার জন্য আমরা রাস্তার আড়ালে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম জীপটিতে অসামরিক লোক রয়েছে। জীপে চালকের পক্ষে সাদা পোশাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক বসা। রাস্তায় এসে জীপটি থামাবার ইঙ্গিত দেই। পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি রাজবাড়ীর মহকুমা প্রশাসক। নাম শাহ ফরিদ। তাঁর কাছে টুকরো খবর পেলাম। শাহ ফরিদ গিয়েছিলেন। সেখান তিনি চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তিনি জানান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তওফিক এলাহী চুয়াডাঙ্গার পুলিশ ও বিডিআর এর সাথে যোগাযোগ করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে। ঝিনাইদহ, যশোর, রাজবাড়ী ও

কুষ্টিয়ার জনগণ পাক সৈন্যের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করেছে। সেখানে চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এসব খবর শুনে আমরা দু'জন আশান্বিত হই। শাহ ফরিদ আমাকে চিনল কিনা বুঝলাম না। ঢাকার পরিস্থিতি তাকে জানাই। আমি বললাম, আমরা আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের পক্ষ থেকে এই এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে এসেছি। পরে শাহ ফরিদ পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের পুলিশ ও বিডিআরদের কুষ্টিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেই। স্থানীয় একটি বাসে অন্যান্য কয়েকজন যাত্রীর সাথে আমরাও উঠি। কিছু দূর যেয়ে বাসটি আর যেতে পারলোনা। এখন আমাদের সাথে অনেক যাত্রী। কামারখালী পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। সামনে নদী পার হতে হবে। একটি মাত্র খেয়া নৌকা। যাত্রী বেশী। নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল। নৌকা প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা। অনেক কষ্টে নদী পার হলাম।

আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। হাঁটতে আমাদের বেশ সুবিধা হলো। এখান থেকে মাগুরা ৮ মাইল। আমাদের সাথে আরো অনেকে রয়েছে। তারা ঢাকা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু ছাত্র-যুবকও রয়েছে। আমরা এদের মধ্যে অচেনা রয়ে গেছি। যেমনি ছিলাম সারা পথে। ঘনিষ্ঠ কর্মী ছাড়া কারো কাছে নিজেদের পরিচয় দেইনি। সন্ধ্যাবেলা কামারখালী ঘাটে রেডিও শুনি। রেডিওর কাছে বহু লোক ভিড় করে। বেতারে টুকরো টুকরো খবর প্রচার করা হয়। “মুক্তিবাহিনীর গুলিতে টিক্কা খান আহত”, পাক বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। বেতারে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানানো হয়।

মাগুরা খালের ওপর কাঠের পুলটি পুড়তে দেখলাম। শত্রুদের গতিরোধ করার জন্যে নিজেরাই পুল পুড়াচ্ছে। টর্চের আলোতে ওপারে সঙ্গীন দেখা গেল। বললাম, আমরা বন্ধু। পার হওয়ার জন্যে একটি মাত্র ছোট নৌকা ছিল। দুই জনের বেশী নৌকায় ওঠা যায় না। আমরা দুইজন সকলের শেষে পার হই। ওপারে গেলে সকলের দেহই তল্লাশী করা হলো। আমার পর তাজউদ্দিন ভাই এর পালা। মুখের দিকে তাকিয়েই জড়িয়ে ধরলো। নেতাকে চিনতে পেরেছে। তাজউদ্দিন ভাইও তাকে জড়িয়ে ধরেছে। রাত তখন অনেক। একটি রিক্সাওয়ালা বাড়ী থেকে ডেকে আনা হলো। আমরা দু'জনে রিক্সায় আর সে হেটে চলে। অনেক রাতে আমরা আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেনের বাড়ী পৌঁছি। সোহরাব ভাই এর স্ত্রী রাতের বেলা আমাদের জন্য রান্না করেন। খেতে খেতে ভোর হয়ে গেল। সোহরাব হোসেন এখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। মাগুরার মহকুমা প্রশাসক কামাল সিদ্দিকী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। স্থানীয় কর্মীরা তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সিদ্দিকী আমার পূর্ব পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্য কয়েকজনের সাথে সিদ্দিকীকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল।

আমি তার পক্ষে মামলার কৌসুলি ছিলাম। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালেও সিদ্দিকী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আমরা দু'জন ও সোহরাব ভাই জীপযোগে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে বিনাইদহ পৌঁছি। সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আজিজের বাসায় উঠি। আমরা সেখানে পৌঁছে এসডিপিও

মাহবুবউদ্দিনকে খবর পাঠাই। মুক্তিযুদ্ধকালে মাহবুবুরে ভূমিকা ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল। পরে তিনি ঢাকার পুলিশ সুপার হন। মাহবুব ঝিনাইদহে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে। আমাদের দেখে খুবই উৎফুল্ল হলো। এই কন্ট্রোল রুম থেকে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যশোর সেনানিবাসের চারদিকে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছে। হাজার হাজার লোক বজ্র কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে সেনানিবাস পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে। জনতার হাতে বন্দুক, রাইফেল, বল্লম, বর্শা, দা, কুড়ালসহ স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র। কুষ্টিয়াতে তিনশতাধিক পাক সেনা মুক্তিবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ থেকে ২৮ মাইল দূরে। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার আবাদ্দালী মহকুমা প্রশাসককে হত্যা করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার আবাদ্দালী জেলা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী। আমরা চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কুষ্টিয়ার অবরোধ জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। বিভিন্ন জরুরী নির্দেশ দিয়ে আমরা দুইজন ও মাহবুব চুয়াডাঙ্গা চলে যাই। সেখানে পৌঁছে তওফিক এলাহী ও মেজর ওসমানের সাথে ব্যাপক আলোচনা হয়।

চুয়াডাঙ্গার সকল আওয়ামী লীগ কর্মীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। ইতিমধ্যে আমরা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি বিডিআর বাহিনী কুষ্টিয়ায় প্রেরণ করি। কুষ্টিয়াতে পাক সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। গ্রাম থেকে অগণিত লোক শহরে আসে। হাজার হাজার মানুষের শ্লোগানে শহর কেঁপে ওঠে। মানুষের হাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ অস্ত্র। পুলিশের সকল রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। আবাদ্দালী এডিসি সার্কিট হাউজে পাক সেনাদের সাথে অবরুদ্ধ। এডিসি নিহত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে। তিনি একজন পাক জেনারেলের আত্মীয়। কুষ্টিয়ার সর্বশ্রেণীর লোক যুদ্ধে অংশ নেয়। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাত, ডাব, রুটি, পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি পাঠায়। আমাদের অগণিত সৈনিকের রসদের কোন অভাব হয়নি। ঝিনাইদহ থেকে খবর পাই, কিছু সংখ্যক পাক সৈন্য ভয়ে পালিয়ে গেছে। সিরাজগঞ্জ পারাগঞ্জ ব্রিজ আমার বাড়ীর পাশে। যশোর-কুষ্টিয়ার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তার ওপর এই ব্রিজ দিয়েই যশোর থেকে পাক বাহিনী কুষ্টিয়া আসতে পারে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজের পাশে মাটি কেটে এর উপর চট বিছিয়ে দেয়। চটের মধ্যে আলকাতরা দিয়ে রাস্তা পিচের মত কালো করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে পাক সেনাদের একটি পলাতক জীপ সেই খাদে পড়ে যায়। গ্রামের লোক ওদের পিটিয়ে মারে। এমনভাবে কুষ্টিয়ার গ্রামের মানুষ পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের পিটিয়ে মারে। চুয়াডাঙ্গা থেকে খবর পাই, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়ী হয়েছি। ওরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পলায়নোন্মুখ। এদের একজনও যশোর সেনানিবাসে ফিরে যেতে পারেনি।

দুপুরে চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়ার বীর জনতার প্রতি একটি অভিনন্দন বাণী পাঠাই। আমার এই বিবৃতি ভারতের কয়েকটি কাগজে প্রকাশিত হয়। চুয়াডাঙ্গা গিয়ে তিন ভাগে বৈঠক করি। একটি রাজনৈতিক, একটি সামরিক অপর বৈঠকটি করি তওফিক ও মাহবুবকে নিয়ে। তওফিক একাধারে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক।

সেখানে বসে পাবনার খবর পাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের যোগ দিয়েছেন। মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর আমাদের অবস্থা ভাল। যশোর সেনানিবাস বীর জনতার দ্বারা তখনো অপরূপ। ঢাকার অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। চট্টগ্রামের খবর বিপ্লবী বেতারযোগে পেয়েছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, সারা বাংলায় গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ চলছে। বাংলার সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশসহ সর্ব শ্রেণীর লোক সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বীরজনতার মনোবল থেকে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত হই। বিভিন্ন স্থানে খন্ড যুদ্ধে আমরা জয়ী হলেও বিশাল পাক বাহিনীর সাথে লড়াই করার মত অস্ত্রসম্ভার এই মুহূর্তে আমাদের নেই। তবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জনতার যে শক্তি দানা বেঁধে উঠেছে, একে সুসংহত করতে হবে। জনযুদ্ধের প্রতিক্ষণের ব্যবস্থা করে যোদ্ধাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তুলে দিতে হবে। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার কৌশল আমাদের যোদ্ধাদের শিখাতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় তৌফিক, মাহবুব ও মেজর ওসমানের সাথে আবার বৈঠক করি। ডাঃ আসহাবুল হক আমাদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করছেন। অস্ত্রের জন্য ভারত যেতে আমাদের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। বেলা ৩টার দিকে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই সীমান্তের পথে রওয়ানা হই। তওফিক ও মাহবুব আমাদের সাথে ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সীমান্ত পার হবো না বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বাধীন দেশের সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়েই আমরা ভারতে যাব। স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের গ্রহণ করলেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের আলোচনা সম্ভব। সীমান্ত থেকে কিছু দূরে একটি জঙ্গলের মাঝে খালের ওপর একটি বৃটিশ যুগের তৈরী কালভার্ট। কালভার্টের ওপর তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বসে আছি। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে তওফিক ও মাহবুবকে ওপারে পাঠাই। তাজউদ্দিন ভাইকে বিষণ্ণ মনে হলো। তার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ছোট বেলার একটা কথা তার মনে পড়ছে। তিনি বলতে থাকেন ছোট বেলা হিন্দু সহপাঠীরা বলতেন, তোদের পাকিস্তান টিকবেনা। আমি পাল্টা জোর দিয়ে বলতাম অবশ্যই টিকবে। ছোট বেলার সহপাঠীদের কথা তার মনে পড়ছে। সূর্য ডুবু ডুবু করছে বাংলাদেশের আকাশে আবার কখন নতুন সূর্যের উদয় হবে, তা ভাবতে ভাবতে আমরা দু'জনই কালভার্টের ওপর শরীর এলিয়ে দেই। তওফিক এলাকী ও মাহবুব চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। ওরা ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িয়ে গেছে। জঙ্গলের ভেতর বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। জনবসতি নেই বললেই চলে। চারদিকে আগাছায় ভরে গেছে।

আরো কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তাজউদ্দিন ভাইকে ডেকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। শব্দ ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসছে। আগন্তুকরা কাছে এসেই হাতের অস্ত্র উঁচু করে সামরিক কায়দায় আমাদের অভিবাদন জানান। অফিসারটি জানান, আমাদেরকে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে ছাউনিতে নিয়ে যেতে এসেছেন। আগন্তুক অফিসারের সাথে আমরা ছাউনিতে চলে যাই। ছাউনিতে গিয়ে জানতে পারি যে, আমাদের আগমনের খবর ইতিমধ্যে কলকাতায় পৌঁছে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসএফ এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ছাউনিতে এসে পৌঁছিলেন। রাত আনুমানিক আটটার কাছাকাছি। মিঃ মজুমদার জানান, তাদের হাই কমান্ডের নির্দেশেই তিনি এখানে এসেছেন। আমরা আমাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বাঙ্গিক সাহায্যের আবেদন জানাই। মজুমদার বলেন, আপনাদের আবেদনের জবাব শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই বলতে পারেন। তিনি জানান, আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তার সাথে কলকাতা যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, তা পক্ষে ছোট ছোট অস্ত্র শস্ত্র দেয়া সম্ভব। তবে দিল্লীর সাথে আলোচনা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।

তওফিক এলাহী ও মাহবুবকে বিদায় দিয়ে মজুমদারের জীপে করে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কলকাতা যাত্রা শুরু করি। মজুমদার নিজে গাড়ী চালিয়ে আমাদের দমদম বিমানবন্দরে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, আমাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই ফ্লাইটে দিল্লী থেকে একজন কর্মকর্তা আসবেন। তার এ কথা শুনে আমরা কিছুটা আশ্চর্য হই। রাতেই তার সাথে আমাদের দেখা হবে। আমাদের আগমনের কথা শুনেই মজুমদার দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করেন। জীপ থেকে নামিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত বড় কালো রঙ এর একটি গাড়ীতে তোলা হলো। বিমান থেকে ছয় ফুটেরও বেশী লম্বা একজন লোক নেমে সোজা আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। মজুমদার তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি হলেন বিএসএফ এর প্রধান রুস্তমজী। রুস্তমজী এক সময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন। নেহেরু পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুবই আস্থাভাজন। এদিকে আমাদের কাপড় চোপড়ের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। গাড়ীতেই শুরু হয় আলোচনা। রুস্তমজীর প্রথম প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কোথায়? মজুমদারের প্রথম প্রশ্নও ছিল এটাই। এরপরেও আরো অনেকের সাথে দেখা হয়েছে, সকলেরই প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কেমন আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা তৈরি ছিলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা সহ সকলের সাথে বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের ব্যাপারে আমরা একই উত্তর দিয়েছি। আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হলো বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাচ্ছি। তিনি জানেন, আমরা কোথায় আছি। তিনি আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। সময় হলে বা প্রয়োজন দেখা দিলে, তিনি উপযুক্ত স্থানে আমাদের সাথে দেখা করবেন। একটি সুন্দর বাড়ীতে (আসাম হাউজ) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। একটি ঘরে আমি তাজউদ্দিন ভাই, অন্য ঘরে রুস্তমজী। আমরা খুবই ক্লান্ত হান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সাথে অতিরিক্ত কোন কাপড় নেই। রুস্তমজী আমার পরিধেয় বস্ত্রের অভাবের কথা জেনে তার ইঙ্গীত করা পায়জামা ও কোর্তা দিলেন। ছ'ফুট লম্বা মানুষের কোর্তা সামাল দেয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রায় মধ্যরাত হানের কাজ সেরে নিলাম। এত রাতে খাবার পাওয়া কষ্টকর, তবুও মজুমদার আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। খাওয়ার পর টেবিলের ওপর রাখা একটি মানচিত্রের দিকে আমরা চোখ রাখি। কোনদিন যুদ্ধ করিনি এর কথা ভাবিনি। অথচ

আজ যুদ্ধের পরিকল্পনায় অংশ নিতে হচ্ছে। রক্তমজী রণকৌশলী। আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে জানালাম।

আজ রাতেই আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের একত্রিত করে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করা? বিএসএফ এর বিভিন্ন প্রধানদের এই গভীর রাতে ডাকা হয়। তার যোগাযোগ প্রধানের সাথে এই রাতেই যোগাযোগ করা হলো। আওয়ামী লীগের এমএলএ, এমপি সহ নেতাদের একটি তালিকা তৈরী করে তাদের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এ সব নেতার সাথে যোগাযোগের জন্য এই তালিকা বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হয়। আমরা বিশেষ ক'জন দলীয় নেতার কথা জানালাম যাদের সাথে আমাদের সহসাই যোগাযোগ করা প্রয়োজন। যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়লাভ করেছি এবং চুয়াডাঙ্গাতেও আমাদের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অতি দ্রুত আমাদের সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের এই খবর পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। বিএসএফ এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাসহ নেতৃবৃন্দের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দেয়া শুরু করি। যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব সাহায্য দিতে বিএসএফ রাজী হলো। পরামর্শ করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য আমরা বিছানায় যাই। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে রেডিওর শব্দ শুনি। বিএসএফ এর চট্টপাধ্যায় এই রেডিও দিয়েছিলেন। রেডিওতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনি। আমাদের মা-বোনদের ওপর বর্বর অত্যাচারের কথা শুনে মনের অজ্ঞাতেই বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত দু-চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। বিএসএফ আমাদের আতিথেয়তার ভার নেয়। চট্টপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। ৯ মাস আমাদের সাথে তিনি বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করেছেন। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। একজন বিদেশী রাষ্ট্রের কর্মচারী হয়ে এমন নিষ্ঠার সাথে কাজ করেও তিনি কোনদিন কৃতিত্বের দাবী করেননি। মিঃ চট্টপাধ্যায় আমার জন্য একটি প্যান্ট ও একটি শার্ট যোগাড় করলেন।

আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো। যে সব স্থানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ পর চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ হলো। চুয়াডাঙ্গাকে আমরা বিপ্লবী সরকারের রাজধানী করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করেছি। পরদিন দেখি, সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই খবর ফাঁস না করার জন্যে ডাঃ আসহাবুল হককে আমি আগেই অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, আনন্দের আতিশয্যে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে তিনি তা বলে দিয়েছেন। ডাঃ আসহাবুল হক, মেজর ওসমান ও তওফিক এলাহীর সাথে আমাদের ফোনে যোগাযোগ হল। মেজর ওসমানকে বললাম তার সাথে খুব সহসাই আমাদের দেখা হবে। তিনি বেশ প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা তৈরী করে রাখেন। সেদিন ছিল কলকাতায় 'বন্দ'। বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে এই বন্দ ডাকা

হয়। কলকাতার জনজীবন একেবারে স্তব্ধ। গাড়ী ঘোড়া সব কিছু বন্ধ। কলকাতার ভাইরা সেদিন আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। কলকাতা পাক সরকারের কার্যালয়ের চারদিকে হাজার হাজার জনতা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আমাদের জন্য একটা বাড়ী দরকার। রম্ভমজী বাড়ীর সন্ধানে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

পাকিস্তান কনসুলেট এর কাছে আমাদের জন্য একটা বাড়ী নির্বাচিত করা হলো। ঘরে ফিরেই তাজউদ্দিন ভাই ও আমি তিনটি খসড়া পরিকল্পনায় হাত দেই। এগুলো হলো দলের সাংগঠনিক, সরকার গঠন ও সামরিক পরিকল্পনা কাজ। যা মাথায় তাই লিখেছি। সাথে সাথে ছক কেটে তীর চিহ্ন দিয়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করেছি। এরপর মুক্তিযুদ্ধের জন্য সারাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। পরদিন আমাদের দিল্লী যাওয়ার কথা। বিএসএফ ও অন্যেরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করেছে আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য। পরদিন সকালে সীমান্তের দিকে যাই। খবর অনুযায়ী মেজর ওসমান অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা তৈরী করে নিয়ে আসেন। মেজর ওসমানকে কিছু অস্ত্র দেয়া হলো। এর মধ্যে এলএমজিও ছিল। ইতিমধ্যে খবর এলো সৈন্যরা যশোর সেনানিবাস থেকে বের হবার চেষ্টা করেছে। তাকে এক্ষুণিই যেতে হবে। মেজর ওসমান সদ্য পাওয়া এলএমজি কাঁধে নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হলেন। চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, যশোর অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর ওসমানের সাথে তার স্ত্রীও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই তেজস্বী মহিলা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সাহসী এই বীরের স্ত্রী বেগম ওসমান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। একদিকে তিনি স্বামীকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতেন, অপরদিকে বিডিআর জোয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি অনুপ্রাণিত করতেন। নিজের হাতে রান্না করে তিনি যুদ্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর রাতে সেনা বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে বেগম ওসমান নিহত হন।

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল। আজ আমরা দিল্লী যাচ্ছি। গোলক মজুমদার আমাদের সাথে আছেন। সরজিৎ চট্টপাধ্যায়ের বিমানবন্দরে আমাদের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কক্ষে আমাদের বসা ব্যবস্থা করা হয়। সাংবাদিক ও অন্যান্য যাত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের যেতে হবে। ইতিমধ্যেই চট্টপাধ্যায় আমাদের দুজনের জন্য একটি স্যুটকেস ও একটি ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। হাত ব্যাগে কাগজপত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি রয়েছে। স্যুটকেসে আমাদের পরিধেয় কাপড়, তোয়ালে ও সাবান। রাত ১০টার দিকে জীপে করে মিলিটারী মালবাহী বিমানের কাছে আমাদের নিয়ে আসা হল। মই দিয়ে আমরা বিমানের ককটিটে উঠি। পাইলট ও তার সহকারীদের ছাড়া বিমানে বসার অন্য কোন আসন নেই। শুধুমাত্র ক্যানভাসের বেঁট দিয়ে আমাদের চারজনের বসার একটি ব্যবস্থা করা হল। বিমানের পিছন দিক উন্মুক্ত। এ দিয়ে অনায়াসে উঠা নামা করা যায়। তখনও এতে মাল ভর্তি ছিল। এই মালবাহী সামরিক বিমানে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সকল এজেন্সী থেকে আমাদের যাত্রা গোপন রাখা। এটা ছিল একটি পুরনো রাশিয়ান বিমান। এর শব্দ ছিল বিকট। বিমানের যাত্রা

শুরু হল। সমস্ত ককপিট কাঁপছে। তাজউদ্দিন ভাই বেশ চেষ্টা করেও ওভাবে বসে থাকতে পারলেন না।

দিল্লী পৌছতে রাত শেষ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর একটা ক্যানভাস বিছিয়ে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই মেঝেতে শুয়ে পড়ি। গরমে আমরা ঘামছিলাম। বিমানের কাপনের সাথে আমাদের শরীরও কাঁপছিল। এমনি করে আধা ঘুমে আধা জাগা ভোরের দিকে আমরা দিল্লী পৌছি। সেখানে মিলিটারী বিমানবন্দরে আমাদের জন্য একটি গাড়ী প্রস্তুত ছিল। একজন কর্মকর্তা আমাদের নিয়ে গেলেন। চট্টপাধ্যায় আমাদের সাথে ছিলেন। মজুমদার গেলেন তাঁর মেয়ের বাসায়। প্রতিরক্ষা কলোনীর একটি বাড়ীতে আমাদের রাখা হলো। পরে জেনেছি বাড়ীটি ছিল বিএসএফ এর একটি অতিথিশালা। এ বাড়ীতে অন্য আর কেউ নেই। আমি ও তাজউদ্দিন ভাই এক ঘরে, চট্টপাধ্যায় অন্য ঘরে। আমাদের ঘরে দুটি বিছানা রয়েছে। ঢাকা থেকে বেরোবার পর থেকে দু'জন একত্রেই থাকছি। এতে সুবিধা অনেক। রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত সব কিছু পর্যালোচনা করার সুযোগ পাই। গোলক মজুমদার ও রুস্তমজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের বৈঠকের ব্যবস্থা করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। আমাদের কিন্তু বিলম্ব সহিছে না। ইতিমধ্যেই দিল্লীর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রশ্ন তুলেছে যে মহম্মদ আলী প্রকৃতই তাজউদ্দিন আহমদ এবং রহমত আলী ব্যারিষ্টার আমীর উল ইসলাম কিনা। ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আচরণে কখনো অবাক হয়েছি আবার কখনো ভীত হয়েছি। তবে 'র' নামক গোয়েন্দা সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় খুবই ব্যস্ত ছিল। এই সংস্থাটির কার্যকলাপে কখনই আমি সন্দেহ হতে পারিনি। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আমাদের সাথে আলাপ করে। তারা নিশ্চিত হতে চায় আসলেই আমরা আওয়ামী লীগের লোক কিনা। তাদের আলোচনার পর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মিঃ কাউলের কিছুটা বিশ্বাস জন্মে যে সত্যিই আমরা আওয়ামী লীগের লোক। মেজর ওসমানের অস্ত্রের তালিকাটা তখনো আমার পকেটে। কথায় কথায় মিঃ মীরন আমাদের জানান যে, আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র পেতে আমাদের বিলম্ব হবে। মিঃ মীরনের কাছে আরো জানতে পারি, লন্ডনে মিনহাজ উদ্দিনের সাথে তাদের কথা হয়েছে। আমাদের কোন খবর থাকলে তিনি তা পৌছে দিতে পারেন। মিনহাজ আমার পূর্ব পরিচিত।

আমি তাকে চিঠি লিখি। আমি চিঠিতে অস্ত্রের একটা তালিকা পাঠাই। তাকে জানাই, লন্ডনস্থ বাঙ্গালীরা ইচ্ছা করলে আমাদের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। তখনো বুঝে উঠতে পারিনি অস্ত্র কেনা ও তা সরবরাহ করা তত সহজ নয়। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম, রেহমান সোবহান ও আনিসুর রহমান দিল্লীতে পৌছেছেন। তাছাড়া এম আর সিদ্দিকী, সিরাজুল হক বাচ্চু মিয়া ও যুবনেতা আব্দুর রউফ তখন দিল্লীতে ছিলেন। তাদের সকলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের বৈঠক হয়। এম আর সিদ্দিকীর কাছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মোটামুটি কিছু খবর পাই। তার কাছে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের কাহিনীও শুনি। তিনি জানান, মেজর জিয়া একটা জীপে করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা এক প্রকার জোর করে জিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করান। তিনি আরো জানান, চট্টগ্রাম থেকে তারা একটি ট্রান্সমিটার আগরতলাতে নিয়ে এসেছেন এবং তা দিয়ে প্রচার কাজ চালানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও জনগণ তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একটি সরকার গঠন করার জন্য তিনি আমাদের অনুরোধ জানান। কর্মীদের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি আগরতলা চলে যান। তবে তাকে সরকার গঠন করার ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। আব্দুর রউফকে কিছু নির্দেশসহ রংপুর পাঠিয়ে দেই। এসময় ময়মনসিংহ থেকে রফিকউদ্দিন ভূইয়া ও সৈয়দ আব্দুস সুলতানের চিঠি পেলাম। সৈয়দ সুলতান বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমনিভাবে দিল্লী আসার পর ২ দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছেন।

আমরা তাদের দু'জনকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, বাঙ্গালী হলেও আমাদের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সত্তা বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা আমাদের ৫৪ হাজার বর্গ মাইল ভূ-খন্ডের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দিন ভাই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাৎকালে তাদের কোন সহযোগী ছিল না। বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও পূর্বাপর আলোচনার বিষয় আমার জানা ছিল। সাক্ষাতে যাওয়ার পূর্বে তাজউদ্দিন ভাই আমার সাথে কয়েক ঘণ্টা ধরে সম্ভাব্য আলোচ্য সূচী নিয়ে আলোচনা করে যান। মিসেস গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিনের ভাই আমাকে সব কিছু জানান। মিসেস গান্ধী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তাজউদ্দিনের ভাই এর গাড়ী পৌছে যাওয়ার পর তাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ষ্টাডি রুমে নিয়ে যান। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন “হাউ ইজ শেখ মুজিব, ইজ হি অল রাইট?” এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কেননা এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদেরকে আরো অনেক বার হতে হয়েছে। মিসেস গান্ধীর প্রশ্নের জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু’ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২৫মার্চের পর তাঁর সাথে আমাদের আর যোগাযোগ হয়নি। সাক্ষাতে তাজউদ্দিন ভাই আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে কোন মূল্যেই এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান আমাদের আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা চালাতে পারে। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমাদের অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দিন ভাই ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশের নেতা জানান, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোটনিরপেক্ষ, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি শত্রুতা নয়। বাংলার মানুষের সংগ্রাম মানবতার পক্ষে ও হিংস্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সরকারের সহায়তা আমরা চাই। একটি সরকার গঠনের

প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিত। এদিকে সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুট স্বরে তিনি বলে ফেললেন বঙ্গবন্ধু আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সঙ্গে জানতে চাইলাম, সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই দ্বিধাগ্রস্ত কেন? জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন আপনি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আমার সরল মনের কাছে দেশের এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে হয়। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে নিয়ে সরকার গঠন করা হবে? আমি স্বাভাবিক উত্তর দিলাম। বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে রেখে গেছেন। আমি বললাম, যে ৫ জন নিয়ে বঙ্গবন্ধু হাই কমান্ড গঠন করেছিলেন, এই ৫ জনকে নিয়েই সরকার গঠন করা হবে। দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু, সাধারণ সম্পাদক ও তিনজন সহ সভাপতি নিয়ে এই হাই কমান্ড পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। তাজউদ্দিন ভাই পুনরায় প্রশ্ন করেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? দ্বিধা না করে এবারও জবাব দিলাম, ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত যিনি প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দায়িত্ব পালন করবেন। তাজউদ্দিন ভাই অনেকক্ষণ ভাবলেন।

আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা কোনভাবেই তিনি নাকচ করতে পারলেন না। তিনি এত বেশী কেন ভাবছিলেন তার উত্তর জানতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। তাজউদ্দিন ভাই নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী পুরুষ। দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে দল ও দেশের স্বার্থে কাজ করতেন। নিজে বেশী ভাগ কাজ করেও তিনি কৃতিত্বের দাবি করতেন না। সকল কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বদাই দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি যখন বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেয়ার জন্যে তার প্রস্তাব করি তখন এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এই দায়িত্বের গুরুভার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আবার আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন, এ নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। পত্রিকাতে ইতিমধ্যে অনেকের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য পত্রিকাতে প্রকাশিত নিহতের তালিকায় তাজউদ্দিন ভাই এবং আমার নামও রয়েছে। নিহতের তালিকায় আমাদের দুজনের নাম দেখে ভেবেছিলাম, আমাদের নেতারাও হয়তো জীবিত রয়েছেন। আমাদের আরো চিন্তা হলো বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করা হলে আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া হবে। অথবা তার জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ দেখা দেবে কিনা। এ নিয়ে দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করি। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেই আবার খন্ডন করি। শেষ সিদ্ধান্ত নিলাম, ফলাফল যাই হোক, বঙ্গবন্ধুকে সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই বলেন,

আমি দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে তাঁর সাথে কাজ করেছি। তবে এই ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে কোন প্রকার ভয়ভীতি বা চাপের মাধ্যমে পাক সরকার বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোন বিবৃতি দিতে সমর্থ হবে না। আমরা যেহেতু একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম এবং বঙ্গবন্ধু তখন শত্রুর কারাগারে বন্দী কাজেই সে সময়ে আমাদের সব কিছুই ভাবতে হয়েছিল। তাছাড়া ভাবাবিধির বেশী সময়ও ছিল না। কেননা আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। একটা সরকার গঠন করা ছাড়া কাজ এগুনো যাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের সিপাহশালার শত্রুর হাতে বন্দী। আবার তাঁকে বাদ দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের কথা কল্পনাও করা যায় না। তারপর কথা উঠলো দেশের নাম কি হবে। আমি বললাম, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। তাজউদ্দিন ভাই এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করা সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল। এ সময় সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ঠিক করা দরকার। মনোগ্রাম আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে মনোগ্রাম সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আমার হাতে আঁকা। চারপাশে গোলাকৃতি লাল এর মাঝখানে সোনালী রঙ এর মানচিত্র। মনোগ্রাম দেখে তাজউদ্দিন ভাই পছন্দ করলেন। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি তা অনুমোদনও করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম সরকারী অনুমোদন। এই দিন সন্ধ্যার পর রেহমান সোবহানা, ডঃ আনিসুর রহমান আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। রেহমান সোবহান এর আগে একবার দেখা করে গেছেন। এ সময় আনিসুর রহমান স্বচক্ষে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেন। তিনি নিজের বাসার গেটে তালা বুলিয়ে অন্যদিক দিয়ে বাসায় ঢুকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসার মেঝেতে শুয়ে রাত কাটান এবং জানালা দিয়ে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেন। পাক দস্যুরা তার বাসার গেটে দরজায় তালা দেখে চলে যায়। সারাদিন আমি তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা তৈরী করছি। রেহমান সোবহান বক্তৃতার খসড়া রচনায় আমাকে সহায়তা করেন। সেদিনই তার কাছে জানতে পারি যে, ডঃ কামাল হোসেন গ্রীষ্মতার হয়েছেন। রেহমান সোবহান জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। তাঁর ইংরেজী খসড়ার একটা অংশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা ছিল Pakistan is dead and buried under mountain of corpses বাংলায় এর অনুবাদ করি পর্বত প্রমাণ লাশের নীচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখি। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছেলেদের রক্ত ও ঘামে মিশে জন্ম নিচ্ছে নতুন বাংলাদেশের। এক সময় চোখের জলে বক্তৃতার খসড়ার এক অংশ ভিজে গেল। চোখ মুছে আবার লিখতে শুরু করি।

লেখা শেষ হলে সমস্ত বক্তৃতাটা তাজউদ্দিন ভাইকে শোনাই। রাজনৈতিক খসড়া প্রণয়নে তাজউদ্দিন ভাই খুবই দক্ষ। একটি খসড়া করার পর তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মাথা নাড়তেন, কোন স্থানে থেমে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতেন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন। এমনভাবে চূড়ান্ত বক্তব্য তৈরী হতো। আমাদের দু'জনের মন ও চিন্তা যেন একইভাবে কাজ করছিল। আমার হাতের লেখা খুব

ভাল নয়। তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা টেপ করতে হবে। আমি একটি টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করি। তিনি সমস্ত বক্তৃতা নিজের হাতে লিখে নিলেন। চট্টপাধ্যায় তার নিজের হাতে আরো একটি কপি করে নেন। তখন তিনজনের হাতে বক্তৃতার তিনটি কপি হয়ে গেল। পরদিন তাজউদ্দিন ভাই দ্বিতীয়বারের মত ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধী জানান, বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য এই খবর পাকিস্তান সরকার তখনো সরকারীভাবে প্রকাশ করেনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, তাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর প্রচারের জন্য একটি বেতার স্টেশন স্থাপনের বিষয়ও আলোচনা হয়। এদিকে আমাদের নেতারা কে কোথায় আছেন সে খবর আমরা এখনো জানিনা। তাঁদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য একটি ছোট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে আমাদের সাথে দেন। ঐ জেনারেলের নাম নগেন্দ্র সিং। তাঁর বয়স ৬০'র উর্ধ্বে। তিনি সামরিক ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দেবেন। জেনারেল সিং মনেপ্রাণে একজন খাঁটি সৈনিক। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধর্মপ্রাণ। তাছাড়া মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ। আমাদের সংগ্রামের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল। দিল্লীতে বসেই তাজউদ্দিন ভাইয়ের বক্তৃতা টেপ করা হয়। বক্তৃতার পূর্বে আমার কণ্ঠ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয় এখন তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবেন। এরপর তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা শুরু করেন। আমরা বিমানে করে আবার কলকাতা ফিরে এলাম। এখানে এসে জানলাম মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান (হেনা ভাই এসেছেন। তাঁদের কথা শুনে কিছুটা স্মৃতি পেলাম। খবর নিয়ে জানলাম কলকাতায় গাজা পার্কের কাছে বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই থাকেন।

শেখ ফজলুল হক মনি ঐ বাড়ীতে আছেন। পরে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও সিরাজুল ইসলাম খান এই বাড়ীতে ঘাঁটি করেন। আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কামরুজ্জামান ভাইরে কাছে দেখা করতে গেলাম। আমরা তার কাছে এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী ব্যক্ত করি। কামরুজ্জামান ভাইয়ের মনে একটা জিনিস ঢুকানো হয়েছে যে আমরা তাহাছড়া করে দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছি নেতাদের জন্য অপেক্ষা করা আমাদের উচিত ছিল। শেখ মনি আমাকে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এটা বুঝালেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের বিলম্বে সাক্ষাত হওয়ার কারণ হলো তাঁরা এখান থেকে ক্রিয়ারেপ দেননি। তিনি বুঝাতে চাইলেন তাঁরা একটি শক্তিশালী গ্রুপ এবং তাঁদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের সরকার গঠনের ব্যাপারে সম্ভ্রষ্ট নন এমন অনেক এম.পি এম এল এ ও আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতায় এসেছেন। প্রিন্সেস স্ট্রীটের এম এল এ হোস্টেলে ওঁরা উঠেছেন। একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে আলাপ-আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে

কামরুজ্জামান ভাইকে নিয়ে কতিপয় এম.পি ও নেতা প্রিন্সেস স্ট্রীটে একটি বৈঠক করেছেন। আর এত ভালভাবে সুর মিলিয়েছেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম এই দল দিয়ে কি স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে?

আমরা বিএসএফ'র লর্ড সিনহা রোডের একটি অফিসে অবস্থান করছি। ভারত সরকার আমাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা ভারতের মাটিতে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই কথা প্রকাশ করতে রাজী নয়।

আমাদের নেতাদের বিভিন্নমুখী বৈঠকে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করছি। কামরুজ্জামান ভাই খুবই সুবিবেচক মানুষ। তিনি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বললেন। রাতের বেলা লর্ড সিনহা রোডে আমাদের বৈঠক বসল। উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কামরুজ্জামান, মিজান চৌধুরী, শেখ মনি, তোফায়েল আহমহদ ও আরও অনেকে। শেখ মনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী, বাংলার যুবকরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা চলবে না। মন্ত্রী-মন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রে গড়ে উঠবে আসল নেতৃত্ব। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিপুলী কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

তাজউদ্দিন ভাই ও আমি ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকলে শেখ মনির বক্তব্য সমর্থন করেন। তাজউদ্দিন ভাই যেহেতু নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, তাঁর পক্ষে পাল্টা জবাব দেয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই উঠে দাঁড়াতে হলো। উপস্থিত প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল আমি ও তাজউদ্দিন ভাই আগে ভাগে দিল্লী গিয়েছি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য।

আমি আমাদের দিল্লী যাওয়ার সমর্থনে ও শেখ মনির বক্তব্যের কয়েকটি যুক্তি পেশ করি। আমার প্রথম যুক্তি ছিল, দিল্লী যাত্রার পূর্বে আমাদের জানা ছিলনা কারা বেঁচে আছেন এবং কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলার এখতিয়ার তাজউদ্দিন ভাইয়ের রয়েছে। তাছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হবে। তখন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। তৃতীয়ত আমরা বঙ্গবন্ধুর নিয়োজিত হাই কম্যান্ড নিয়ে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পরিকল্পনা করেছি মাত্র।

আমি আরও বললাম, বাংলাদেশ বার ভূঁইয়ার দেশ। বারটি বিপুলী কাউন্সিল গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই আইনগত সরকার দরকার। কেননা, আইনগত সরকার ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকার একটি আন্তর্জাতিক নীতি। যে কোন জনগোষ্ঠীর তাদের নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পাকিস্তান

হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে। তাই আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার হরণই হচ্ছে জনগণের অধিকার হরণ।

শেখ মনির বক্তব্য খন্ডন করার জন্য দু'টি যুক্তি দিলাম। শেখ মনির প্রস্তাবিত বিপুবী কাউন্সিল যদি বিভিন্ন মতালম্বীরা দুইটি, পাঁচটি বা সাতটি গঠন করে তাহলে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোনটির আদেশ মেনে চলবে না। কোন কাউন্সিলের সাথে বিদেশের সরকার সহযোগিতা করবে। এই ক্ষেত্রে একাধিক কাউন্সিল গঠনের সম্ভাবনাই নয় কি?

সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকারই হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আজকে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে অন্য কোন বিপুবী কাউন্সিল গঠন করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকারকে অবমাননা করা হবে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্যের পর মিজান চৌধুরী ও শেখ মনি ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলে তাদের পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন।

কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, শেখ মনির কথানুযায়ী বিপুবী পরিষদ গঠন করা যায় কি না। আমি তাকে বললাম, তা করা হলে যুদ্ধ বিপন্ন হবে। তিনি আমার কথা আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমি তাকে বলি তার সাথে দেখা করে আমি বিস্তারিত সব কিছু বলবো।

সভার শেষ পর্যায়ে তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা দেন। উপস্থিত সকলে সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেন। ১০ই এপ্রিল বিভিন্ন অঞ্চল সফরের জন্য আমাদের বের হবার কথা রয়েছে। একটি ছোট্ট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। বিমানটি খুব নীচু দিয়ে উড়তে পারে। বিভিন্ন স্থানে ছিটিয়ে থাকা আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা এই সফরের উদ্দেশ্য। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই ও তোফায়েল আহমদ একই বিমানে আমাদের সাথে যাবেন।

পরদিন খুব ভোরে গাজা পার্কের বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই এর সাথে দেখা করে তাকে বিস্তারিত সব কিছু অবহিত করি। তাঁর সাথে বলতে গেলে আমার আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রাণখোলা সহজ সরল মানুষ। দু'জনে একান্তে প্রায় আধ ঘন্টা আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে তার মনের জমাট মান অভিমান দূরীভূত হয়ে গেল। বিপুবী পরিষদ গঠনের জন্য যুবকদের প্রস্তাব যে অযৌক্তিক ও অবাস্তব এবং এটা যে যুদ্ধের সহায়ক হবে না তা তিনি মেনে নিলেন।

তাজউদ্দিন ভাই এর অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার আর কোন আপত্তি রইল না। আমাদের সাথে বিমানে আগরতলা যাওয়ার জন্য কামরুজ্জামান ভাইকে বললাম, তিনি বলেন, যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না। তিনি খবর পেয়েছেন, তার পরিবার পরিজন কলকাতার পথে দেশ ত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তার এখানে থাকা প্রয়োজন। আমি খুশী মনে বিদায় নেই।

১০ই এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওয়ানা হওয়ার কথা। তাজউদ্দিন ভাই, মনসুর ভাই, শেখ মনি, তোফায়েল আহমদ ও আমি লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমানবন্দরে যাই। অন্যান্যের মধ্যে মিঃ নগেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গী হলেন। বিমানটি খুবই ছোট এতে বসার মত ৫/৬টি আসন ছিল।

খুব নীচু দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরী অব্যবহৃত বিমান বন্দরগুলোর কয়েকটিতে আমরা নামি। এগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। ছোট ছোট বিমানবন্দরগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। একটি বিমান বন্দরে আমরা দুপুরের খাবার খাই। বিএসএফ এর মাধ্যমে খবর দেয়া হলো কোন আওয়ামী লীগ নেতার খোঁজ পেলে পরবর্তী কোন বিমান বন্দরে তৈরী রাখতে।

উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোন নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। এদের বেশীর ভাগ কলকাতা এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামি। সেখান থেকে জীপে করে শিলিগুড়ি যাই। শহর থেকে অনেক ভেতরে সীমান্তের খুব কাছাকাছি একটি বাংলাতে উঠলাম। গোলক মজুমদার এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এখানে কোন একটি জঙ্গল থেকে গোপন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা প্রচারিত হবে। এসময় তোফায়েল আহমদ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেখ মনি বলে, তোফায়েল আহমদের কলকাতা যাওয়া দরকার। শেখ মনি কিছু নির্দেশসহ তোফায়েল আহমদকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

মনসুর ভাই এর জ্বর এসে গেছে। তিনি গুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসে আছি। তার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে তার সাথে আলাপ করলাম। তিনি মত দিলেন তাজউদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। এরপর মনসুর ভাই বা কামরুজ্জামান ভাই প্রধানমন্ত্রীর পদের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন তোলেননি। পাঁচজন নেতার মধ্যে তিনজনের সাথে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ভাই এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কোন আপত্তি করবেন না। তাছাড়া তাকে উপরদ্বিগতি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকি রইলো খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন। তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজী করানো যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন ভাই এর প্রথম বক্তৃতা প্রচার করার পালা। তাজউদ্দিন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করার বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেয়া হলো।

শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাই এর সাথে একান্তে আলাপ করতে চাইলেন। আমি বাইরের ঘরে বিএসএফ এর আঞ্চলিক কর্মকর্তার সাথে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা ও শত্রুদের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করলাম। শেখ মনির সাথে কথাবার্তা শেষে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডাকেন। তিনি জানান, শেখ মনি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজী নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এম.পি, এমএল ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মনি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা না করা হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আমি সরকার গঠনের পক্ষে পুনরায় যুক্তি দিলাম। আমি বললাম সরকার গঠন করতে বিলম্ব হলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

তাছাড়া সরকার গঠনের পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমেদের তখনো দেখা নেই। তাঁরা কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে বঙ্গুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকারকে আমরা আশ্বাস দিয়েছি। তাতে বিলম্ব হলে আমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহ পোষন করবেন। আমাদের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে কোন অবস্থাতেই তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত নয়। ভারত সরকারও জানেন, আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচারিত হবে। আমার এসব কথা শেখ মনি মানতে রাজী নন। বেশী করে বুঝাতে চাইলে শেখ মনি জানান, তারা বঙ্গবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এ সময় তাজউদ্দিন ভাই আমাকে বলেন, আমি যেন গোলাম মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা হবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাকে যথা সময়ে জানানো হবে।

গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে আজ বক্তৃতা প্রচার করা হবে না। এ কথা শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলম্ব করা ঠিক হবে? তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব কিছু ঠিক ঠাক সে মুহূর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে, তা আমরা ভেবে দেখছি কিনা। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌঁছে গেছে।

আমি গোলক মজুমদারকে বললাম ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল ১০ই এপ্রিল। রেডিও অন করে রেখে খেতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মনি আছেন। রাত তখন সাড়ে নটা। সেই আকাংক্ষিত মুহূর্ত আসলো। প্রথমে আমার কণ্ঠ ভেসে আসল। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হলো। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

বক্তৃতা প্রচারিত হলো। আমাদের তিনজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি শুধু বললাম, গোলক মজুমদার শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা প্রচার বন্ধ করতে পারেননি। মনসুর ভাই খেয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনতে পাননি। পরে একক সিদ্ধান্তে বক্তৃতা প্রচারের জন্য তাজউদ্দিন ভাই এর কাছে ক্ষমা ও শান্তি প্রার্থনা করি। তিনি বলেছিলেন যে, সে সময় আমার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। সেদিন বক্তৃতা প্রচার না করলে গোলমাল আরো বৃদ্ধি পেত বৈকি।

শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগরতলা গিয়ে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আগরতলা

গিয়ে শেখ মনি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবাদে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাড়ীতে চলে যান।

তাজউদ্দিন ভাই এর বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে কর্নেল (অবঃ) নুরুজ্জামান (সেক্টর কমান্ডার) ও আবদুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনা করি। উত্তরবঙ্গে কয়েকটি সেক্টর রয়েছে। একটা সেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন কর্নেল জামান। তারা জানান, গেরিলা কায়দায় আকস্মিক হামলায় শত্রুদের পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।

আমি অবাস্তালীদের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিলাম। অবাস্তালী বিহারীদের ওপর জনগণ ক্ষুব্ধ। রংপুর ও সৈয়দপুরে বেশ কিছু বিহারী রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে এদের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা হয়ে গেছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হামলা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। অবশ্য অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। ভোরের দিকে তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। তাদের অনেক কাজ। এক মুহূর্ত সময় নেই। যোদ্ধারা তাদের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সরকার গঠনে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১১ই এপ্রিল নাশতা করে আমরা বিমানে উঠি আগে রাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর থেকেই শেখ মুনি চুপচাপ রয়েছেন। বক্তৃতার কথা শুনে মনসুর ভাই উৎফুল্ল। রাতের বিশ্রামের পর মনসুর ভাই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠছেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মনসুর ভাই অবিশ্রান্ত কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কের অবসান হওয়ায় মনসুর ভাই যেন বেশী খুশী।

খুব নীচু দিয়ে আমাদের বিমান উড়ছে। দু'দেশের সীমান্ত সংলগ্ন ছোট ছোট বিমানবন্দরে আমরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের খোজ খবর নিচ্ছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে খোঁজ করার জন্য ময়মনসিংহ সীমান্তে আমরা খবর দিয়ে রেখেছিলাম। সৈয়দ নজরুলকে পাওয়া যেতে পারে এমন একটি স্থানে গিয়ে প্রথমে সুনলাম, নেতৃস্থানীয় কাউকে পাওয়া যায় নি। পরে বিএসএফ এর স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নীচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। একথা শুনে আমরা 'ইউরেকা' বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি।

প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে তাঁরা দু'জন আসলেন। নজরুল ভাই জীপ থেকে প্রথমে নামেন। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে জানলাম ২৫শে মার্চের পর থেকে মান্নান সাহেব খুব কষ্টে দিনকাল কাটিয়েছেন। পাক বাহিনীর ভয়ে তিনি দু'দিন পায়খানায় পালিয়ে ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে সড়ক পথে হেঁটে ময়মনসিংহ এসেছেন। তিনি একেবারে জীর্ণ শীন হয়ে গেছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই ও তার ভাই যথেষ্ট উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দিন ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী তাকে অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। এই দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই উৎফুল্ল হই। আমরা আবার

বিমানে উঠি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আগরতলা। আমরা বিমানে আসন গ্রহণ করি। সামনের আসনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর ভাই। নজরুল ভাই বিমানে বসে ঢাকা থেকে পলায়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি ডাঃ আলীম চৌধুরীর ছোট ভাই এর বাসায় থাকতেন। তিনি ছিলেন নজরুল ভাই এর আত্মীয়। সেই বাসা থেকে পরচুলা ও মেয়েদের কাপড় পরিধান করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মনসুর ভাই একথা নিয়ে এমনভাবে ঠাট্টা করলেন যে বিমানে কেউ না হেসে থাকতে পারলেন না। আমাদের আগরতলা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌঁছেছেন। কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা হলো। তার চেহারা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত গোঁফ তিনি কেটে ফেলেছেন। প্রথমে তাকে চিনতেই পারছিলাম না। আমার নিজেরও দাড়ি কেটে ফেলেছি। দু'জনেই দু'জনকে ডেকে হাসি ঠাট্টা করলাম।

আগের রাতে খন্দকার মোশতাক এসেছেন। ডাঃ টি, হোসেন ঢাকা থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন। এম আর সিদ্দিকী কয়েকদিন পূর্বে আগরতলা এসেছেন। চট্টগ্রাম থেকে জহর আহমদ চৌধুরী এবং সিলেট থেকে আবদুস সামাদও এসে গেছেন। তাছাড়া সেখানে তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলী চাষী ছিলেন।

আগরতলা সার্কিট হাউজের পুরোটা আমাদের দখলে। ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং ভিন্ন একটি ঘরে অবস্থান করছেন। ওসমানী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা তৈরী করে ফেলেন। আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি এর পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেন।

রাতে খাবারের পর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন। খন্দকার মোশতাক খুবই মনক্ষুণ্ণ। নাটকীয়ভাবে তিনি বললেন, আমরা যেন তাকে মদ্রায় পাঠিয়ে দেই। আর মৃত্যুকালে তার লাশ যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোশতাক ডাঃ টি হোসেন এর মধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। দু'জনেই এক জেলার লোক। পারিবারিক পর্যায়েও তাদের সম্পর্ক খুবই মধুর। তিনিই তাকে নিয়ে এসেছেন আগরতলায়।

ডাঃ টি হোসেন এর সাথে আলাপ করে জানলাম, মোশতাক সাহেব প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী। সিনিয়র হিসেবে এই পদ তারই প্রাপ্য বলে তিনি জানান। সারারাত শলা পরামর্শ হলো। অনিদ্রা ও দীর্ঘ আলোচনায় আমি খুবই ক্লান্ত অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভায় থাকতে রাজী হলেন। তবে একটা শর্ত হলো, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে একথা জানান। সবাই এতে রাজী হলেন। কেননা, একটা সমঝোতার জন্যে এই ব্যবস্থাটা একেবারে খারাপ নয়। অবশেষে খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়টির সুরাহা হলো। একজন হেসে খবর দিলেন, তিনি যোগদানে রাজী হয়েছেন। উপস্থিত সকলে এক বাক্যে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন। সকলে জহর ভাইকে মোনাজাত করতে অনুরোধ

করলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করে এসেছেন। তার মাথায় তখনো মক্কা শরীফের টুপি। তিনি আধা ঘণ্টা ধরে আবেগ প্রবণভাবে মোনাজাত পরিচালনা করেন। তার মোনাজাতে বঙ্গবন্ধুর কথা, পাক দস্যুদের অত্যাচার, স্বজন হারানো, দেশবাসীসহ শরণার্থীদের কথা এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেকের চোখে পানি এসে গেল। এই মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বৈঠকে সবগুলোর অনুমোদন দেয়া হয়।

এ দিকে ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং এর বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। বৈঠকের পর এক পর্যায়ে আমি অংশ নেই। এর পূর্বে যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লী কলকাতাসহ দেশের বাইরে ভেতরে সীমাবদ্ধ আলোচনা হয়েছে। সবক'টিতে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। যুদ্ধের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো পুংখানুপুংখ ভাবে বুঝাবার চেষ্টা করি।

১৩ই এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম। মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও আবদুস সামাদ আজাদ ও কর্নেল ওসমানী কলকাতা আসেন। অন্যান্যরা রয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছার ব্যাপারে আমরা ২টি প্রবেশ পথ ঠিক করি। এর একটি হচ্ছে আগরতলা। এই পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন প্রবেশ করবে। অন্যান্য জেলার লোকজনের জন্য প্রবেশ পথ করা হয় কলকাতা। পরে অবশ্য সিলেটের জন্য ডাউকি, ময়মনসিংহের জন্য তোরা পাহাড়, রংপুরের জন্য ভুরুঙ্গামারী, দিনাজপুরের জন্য শিলিগুড়ি, বরিশালেল জন্য টাকি-এরকম বেশ কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ ঠিক করা হয়।

মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্য ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্য আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা প্রথমে চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। পাক দস্যুরা সেখানে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নতুন স্থানের কথা চিন্তা করতে হলো। এই নিয়ে গোলক মজুমদারের সাথে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত হন যে, যেখানেই আমরা অনুষ্ঠান করিনা কেন পাক বাহিনীর বিমান হামলার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রিসভার শপথের জন্য নির্বাচিত স্থানের নাম আমি, তাজউদ্দিন ভাই, গোলক মজুমদার এবং বিএসএফ এর চট্টপাধ্যায় জানতেন। ইতিমধ্যে দ্রুত কতগুলো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নির্ধারণ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার খসড়া রচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বিশ্বের কাছে নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদন জানাতে হবে। ১০ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী প্রথম যে ভাষণ দেন, তার কপি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায়

করা হয়েছিল। ইংরেজী কপি বিদেশী সাংবাদিকদের দেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা।

আমি আর তাজউদ্দিন ভাই যে ঘরে থাকতাম সে ঘরের একটি ছোট্ট স্থানে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে লেখার কাজ করি। আমার কাছে কোন বই নেই, নেই অন্য দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কোন কপি।

আমেরিকার ইণ্ডিপেনডেন্স বিল অনেক দিন আগে পড়েছিলাম। সেই অরিজিনাল দলিল চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই বড় বড় হাতের স্বাক্ষরগুলো। কিন্তু ভাষা বা ফর্ম কিছুই মনে নেই। তবে বেশী কিছু মনে করার চেষ্টা করলাম না। শুধু মনে করলাম। কি কি প্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার রয়েছে। এমনি চিন্তা করে ঘোষণাপত্রের একটা খসড়া তৈরী করলাম। স্বাধীনতার ঘোষণার অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হলো।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার পর তাজউদ্দিন ভাইকে দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন। আমি বললাম, আমরা সকলে এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই দলিলের খসড়াটি কোন একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখাতে পারলে ভাল হতো। তিনি বললেন এই মুহূর্তে কাকে আর পাবেন। যদি সম্ভব হয় কাউকে দেখিয়ে নিন।

ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এদের মধ্য সুব্রত রায় চৌধুরীর নাম আমি শুনেছি। রায় চৌধুরীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। আমি তার লেখা কিছু নিবন্ধ পড়েছি বলে মনে হলো। বিএসএফ এর মাধ্যমে রায় চৌধুরীর ঠিকানা জেনে নিলাম। টেলিফোনে তাকে যোগাযোগ করি। বললাম তার সাথে দেখা করতে চাই। তিনি রাজী হলেন। বালিগঞ্জে তার বাসা। আমার পরিচয়, 'রহমত আলী' নামে। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে তাকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। এই খসড়া আমি করেছি কি-না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দেই। তিনি বলেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলাবার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে আইনানুগ অধিকার তা মানবাধিকারের একটা অংশ। এই কথা স্বাধীনতার সনদে ফুটে উঠেছে। তিনি জানান, তিনি এর ওপর একটা বই লিখবেন। এই ঘোষণাপত্রের একটি কপি তাকে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। এরপর আইন ব্যবসা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বই লেখা শুরু করেন। তার রচিত বইটির নাম হচ্ছে 'জেনেসিস অব বাংলাদেশ'-আন্তর্জাতিকভাবে অধ্যয়নের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তা পড়ানো হচ্ছে।

এটা ছিল সুব্রত চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এরপর থেকে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই এর মত সময়ে অসময়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমার জন্য তাঁর দুয়ার সর্বদাই ছিল খোলা।

এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুটিনাটি তৈরী করা হচ্ছে। জানা গেল প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সামরিক পোষাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোষাক

প্রয়োজন। বিএসএফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোশাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের কোন পোশাক পাওয়া গেল না। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তাঁর জন্য পোশাক তৈরী করা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু'জনে কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হাই। সমস্ত প্রেসক্লাব লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাই নেই। সার্চ লাইটের অসংখ্য চোখ আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ক্লাবের সেক্রেটারী উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদেরকে প্রথম অনুরোধ জানাই আমাদের উপস্থিতির কথা গোপন রাখতে হবে। এরপর বললাম, আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।

সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ই এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে এই প্রেসক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানাই। বললাম, তখন তাদেরকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি বিশেষ বার্তা দেয়া হবে। তাদের কেউ কেউ আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। আমরা কোন উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। এতে তারা কেউ কেউ হতাশও হন। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ী তৈরী থাকবে বলেও জানালাম।

আওয়ামী লীগের এম,পি এমএলএ এবং নেতাদের খবর পাঠিয়ে দেই রাত বারোটার মধ্যে লর্ড সিনহা রোডে সমবেত হওয়ার জন্যে। বিএসএফ এর চট্টপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্যে ১০০টি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে। এর ৫০টা থাকবে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বহন করার জন্যে। অবশিষ্ট ৫০টার মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছানো হবে।

রাত বারোটা থেকে নেতাদের আমি গাড়ীতে তুলে দেই। বলে দেয়া হলো, কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। সকাল বেলা আমরা একত্রিত হবো। গাড়ীর চালক নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেবেন। সাইক্লোস্টাইল করা স্বাধীনতা সনদের কপিগুলো গুছিয়ে নিলাম। হাতে লেখা কিছু সংশোধনী রয়েছে। কয়েক জনকে এগুলো সংশোধন করার জন্যে দেই।

১৭ এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের দিন। সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এম, মনসুর আলী, এই এইচ এম কামরুজ্জামান এবং ওসমানী একটি গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে যান।

আমি ও আবদুল মান্নান ভোরের দিকে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। সেই ভোরেও ক্লাবে লোক ধরেনি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীত ভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন।

আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কেউ জানতে চাইলেন কিভাবে যাবেন, কোথায় যাবেন। আমি পুনরায় বলি, আমি আপনাদের সাথে রয়েছি, পথ দেখিয়ে দেব। আমাদের গাড়ীগুলো তখন প্রেস ক্লাবের সামনে। উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়ীতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০/৬০টা গাড়ী যোগে রওয়ানা হলাম গন্তব্য স্থানের দিকে। আমি ও আবদুল মান্না দু'জনই দুই গাড়ীতে। আমার গাড়ীতে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাদের সাথে অনেক কথা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থান আম্রকাননে পৌঁছতে ১১টা বেজে গেল। অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় শেষ। মাহবুব ও তওফিক এলাহী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করবেন।

এদিকে পাক হানাদার বাহিনীর চাপের মুখে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটেতে হয়েছে। সম্মুখ সমরে হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্দেশ সত্ত্বেও দেশ মাতৃকার মুক্তিপাগল যোদ্ধারা বাংকার ছেড়ে আসতে রাজী হচ্ছিল না। মাহবুব ও তওফিক তাদের সৈন্যসহ পাক হানাদার বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলেন। তারা সুকৌশলে পিছু হটে আসেন। মনোবল ঠিক রেখে পশ্চাদপসরণ করা একটা কঠিন কাজ। ক্রান্ত শ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার থেকে উঠে আসে। ওদের চোখে মুখে বিশ্বাসের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল।

কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিব নগর' নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রীসভা গঠন করেছি। তার সাথে আমাদের চিন্তার (বিস্তার) যোগাযোগ রয়েছে। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী। কিন্তু আমরা তা বলতে চাইনি। পাক বাহিনী বলুক এটাই আমরা চাচ্ছিলাম। কারণ আমরা যদি বলি বঙ্গবন্ধু পাক শিবিরে, আর তারা যদি তা অস্বীকার করে তাহলে সমূহ বিপদের আশংকা রয়েছে। আর আমরা যদি বলি তিনি দেশের ভেতর থেকে যুদ্ধের নেতৃত্বে দিচ্ছেন তখন হানাদাররা বলে বসবে তিনি বন্দী আছেন।

আম বাগানের অনুষ্ঠানে ভর দুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি শ্লোগান। আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে সাংবাদিকদের ফেরত পাঠানো। দুপুরের মধ্যে

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। সাংবাদিকদের গাড়ীযোগে ফেরত পাঠানো হল। মন্ত্রীসভার সদস্যরা ফিরে সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর কলকাতার সাংবাদিকরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই সংবাদ পরিবেশন করেন।

কলকাতার বাসায় ফিরে তাজউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করি কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের হোসেন আলীকে আমাদের পক্ষে আনা যায় কিনা। ফরিদপুরের আত্মীয় শহিদুল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সাথে যোগাযোগ করা হল। হোসেন আলী প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে রাজী হলেন। গংগার ধারে একটি হোটেলে দু'জনের সাক্ষাত হল। হোসেন আলী আমাদের পক্ষে আসতে রাজী হলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে লন্ডনে ফোন করি। লন্ডনের গেনজেজ হোটেলের মালিক তসদুদ আহমদ আমার পুরাতন বন্ধু। এককালে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার সাথে যোগাযোগ করি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ফোন নাম্বার পেলাম। বিচারপতি চৌধুরী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই লন্ডনে ছিলেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

বিচারপতি চৌধুরীর মাধ্যমে লন্ডনের তৎকালীন কাউন্টি কাউন্সিলের সদস্য এলভারস্যান, শ্রমিক নেতা ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ এর সাথে যোগাযোগ করি। ডোনাল্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লন্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় তার সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় সূত্রেই বন্ধুত্ব। ডোনাল্ড ও অন্যান্যদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করার আবেদন জানাই। লন্ডনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ডোনাল্ডের যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তার সাথে টেলিফোনে কথা হলো। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। সে সময় রকিব সাহেব সিলেট থেকে কলকাতা আসেন। তিনি লন্ডন যাবেন। তার কাছে আবু সাঈদ চৌধুরীকে একটা চিঠি দিলাম। চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে মত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে আহবান জানাই। চৌধুরীর সাথে আমার ফোনেও যোগাযোগ হল।

১৮/১৯ তারিখের দিকে ওয়াশিংটন থেকে হারুন অর রশীদ এলেন। তিনি বিশ্বব্যাপ্তে চাকুরী করেন। তার কাছে বিদেশে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের মনোভাব জানতে পারলাম। ওয়াশিংটনে এ এম এ মুহিত ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় তারা একটা গ্রুপ গঠন করেছেন। তিনি তাদের পক্ষে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরে আমরা খবর পেয়েছিলাম প্রফেসর নূরুল ইসলাম কলকাতায় আছেন। ৪৫ মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণের পরদিন (১৮ এপ্রিল) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরো একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সকাল বেলা কলকাতা পাক মিশনের হোসেন আলী সহ মিশনে প্রায় সকল কর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত পাক দূতাবাস এতদিন ধরে যেখানে পাকিস্তানের পাতকা উড়তো, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হল। এই ঘটনায় দেশে বিদেশে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দূতাবাসে সেদিন জনতার ঢল নামে। বিভিন্ন সংগঠন মিছিল করে সার্কাস এভিনিউতে এসে হোসেন আলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। ফুলের মালায় মিশনের প্রাঙ্গন ভরে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম আমাকে প্রেরণ করেন হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। হোসেন আলীর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক ছেলের সাথে পরিচয় হল। তারা সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হলেন। হোসেন আলীর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা এ ব্যাপারে স্বামীকে তিনি প্রচণ্ড সাহস যুগিয়েছেন।

বিদেশী বেতারের সাথে বাংলাদেশের পাক দস্যুদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন। কান্নাজড়িত তার এই বক্তব্য কলকাতা বেতারে প্রচারিত হয়। এই মহিলার হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য যারা শুনেছেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

১৮ই এপ্রিলের পূর্বরাত বেগম হোসেন আলী ও তার এক মেয়ে মিলে স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরী করেন। আমি থাকতে সেখানে বহু লোক এলো হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। বেশীক্ষণ সেখানে আমি অবস্থান করিনি। বহু গণ্যমান্য লোককেও আসতে দেখলাম।

বাংলাদেশের বহু লোক পাক বাহিনীর অত্যাচারে কলকাতায় শরণার্থী হয়েছে। তাদের জন্যে সাহায্য প্রয়োজন। ১৯শে এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ মিশনে কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সাহায্য আসতে থাকে। হোসেন আলী আগেই পাক মিশনের অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে রেখেছিলেন। এই অর্থে মিশন পরিচালনা করা হবে।

পাক মিশনের একজন মাত্র কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য পোষণ করেননি। তিনি তার বাসায় রয়ে গেলেন। মিশনে আসেন না। এই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে তার বাসায গেলাম। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। ১৯৬৪ সাল, তখন মোনায়েম খানের রাজত্ব। এই ভদ্রলোক সে সময় পাবনার পুলিশ সুপার ছিলেন। তার নাম আর আই চৌধুরী। সরকার বিরোধী এক মিছিল করায় পাবনায় সে সময় বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। আমাদের দলের নেতা মনসুর আলী তখন জেলে। আমি ও নাইমুদ্দিন পাবনা গিয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ করি। জেলে আমাদের নেতাদের সাথে দেখা করার পর আদালতে তাদের জামিনের আবেদন করি।

পুলিশ সুপার আর আই চৌধুরীর প্রচণ্ড দাপটের কথা তখন আমার মনে পড়েছিল। তবে ৬৪ সালের চেহারার সাথে আজকের চেহারার কোন মিল নেই। তাঁর স্ত্রী তখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী কলকাতা আসার পর আই চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর ডালিম তার মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়ের পিতা রাজী হননি। পরে ছেলে মেয়ে নিজেদের উদ্যোগে বিয়ে করে। তাজউদ্দিন ভাই তাদের মিলিয়ে দেন।

ক্রমশঃ আমাদের লোকজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিএসএফ বালিগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করে। আমরা সেই বাড়ীতে উঠি। তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একটি ঘরে। অন্য একটি ঘরে সৈয়দ নজরুল ও মনসুর ভাই এবং পৃথক ঘরে খন্দকার মোশতাক। কামরুজ্জামান ভাই থাকতেন তার এক বন্ধুর বাড়ীতে।

১৯শে এপ্রিল থেকেই বাংলাদেশের মিশনের একটি ভবনে তিন তলায় আমি অফিস করছি। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন তৈরী করা। কয়েকজন টাইপিষ্ট আমার সাথে রাত দিন কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর ১০ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিলের বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে হবে। স্বীকৃতির আবেদনপত্রসহ বক্তৃতার বহু কপি তৈরী করা হলো।

স্বীকৃতির আবেদনে দস্তখত নিয়ে একটু ঘাপলার সৃষ্টি হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বন্দকার মোশতাক এগুলোতে নানা অজুহাতে সই দিতে দেরী করলেন। এদিকে আমি অস্থির হয়ে গেছি। কয়েকদিন গড়িমসি করে পরে তিনি সই করেন।

স্বীকৃতির এই আবেদনপত্রগুলো কিছু ডাক যোগে আবার কিছু লোক মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। আবদুস সামাজ আজাদ কিছু চিঠিসহ বিদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমাদের এই স্বীকৃতির আবেদনের খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মোশতাক সাহেবের পরিবার আনার জন্যে ডঃ টি হোসেন আগরতলা থেকে আবার ঢাকা ফিরে গেছেন। আমার পরিবারের খবর সম্ভব হলে নেয়ার জন্যে ডঃ হোসেনকে অনুরোধ করছি। কিন্তু তিনি সন্ধান করেও আমার পরিবারের কোন খোঁজ পাননি। তার আগেই আমার পরিবারকে ঢাকা ছাড়তে হয়েছে। ডঃ হোসেন আমার প্রতিবেশী ডঃ নাইমুর রহমানের বাসায় পরিবারের খোঁজ করেছিলেন। তারা ভাল আছেন বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোথায় তারা এই খবর পাই আরো পরে। কিছুদিন পর ডঃ টি হোসেন কলকাতা ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমি সন্ধ্যায় মিশন থেকে বাসায় ফিরে জানলাম, আমাকে প্রধানমন্ত্রীর ‘প্রিন্সিপাল এইড’ করা হয়েছে। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, আমাকে কেন এই পদে নিয়োগ করা হল। তিনি বললেন, এটা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত এবং আমারও ইচ্ছা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আমার কি করণীয় হবে? তাজউদ্দিন ভাই জানান, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি যা কিছু করবো তার সবকিছুই আপনার কাজের অংশ হবে’।

এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু বেসামরিক অফিসার এসে গেছেন। পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক হান্নানসহ আরো অনেকে। এদের কাজ দেয়া হলো। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কয়েকদিন কাজ করে ফিরে চলে যান।

সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে শত শত লোক প্রতিদিন আসছে। এদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, উকিল, ছাত্র-যুবক, রাজনৈতিক নেতা কর্মী বিভিন্ন স্তরের লোক রয়েছে। সকলেই চলে আসে বাংলাদেশ মিশনে। এদের পেশা জানার উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনে কাজে লাগানো। মিলিটারী, পুলিশ, বিডিআর, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কথা ছিল। এখান থেকে আমি তাদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবার চেষ্টা করতাম। এ সময়টা আমাদের

জন্য চরম সংকটের সময় ছিল। পাক হানাদার বাহিনী প্রচণ্ড হামলা করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রায় সকল ফ্রন্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করছে। এ সময়ে তাদের মনোবল ঠিক রেখে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল খুব কঠিন কাজ।

বনগাঁ সীমান্তে একটা তাঁবুতে মেজর ওসমান, তওফিক এলাহী ও মাহবুব তাদের দলবল নিয়ে অবস্থান করছেন। তখনো তারা ভারতের ভেতরে প্রবেশ করেননি। কাস্টম চেক পোস্টের ওপারে তাদের ছাউনী। সারাদিন অফিসে খুবই ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যে সীমান্তে যোদ্ধাদের খোঁজ খবর প্রতি সন্ধ্যায় নিতে চেষ্টা করতাম। এ সময় আমার জুনিয়ার পার্টনার মওদুদ আহমদ কলকাতা পৌছেন। সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে আমার সাথেই রাখলাম। আমার অফিসের পাশে একটা ঘরে তার বসার ব্যবস্থা হলো। প্রথম দিকে তিনি বিদেশী প্রেসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ কাজ তিনি খুবই দক্ষতার সাথে করেন। পরে তাকে বহিঃপ্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর বাংলাদেশ সরকার ডাকঘর স্থাপন করে। ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ পোস্ট মাস্টার জেনারেল হন। বিমান মল্লিকের নক্সা করা স্ট্যাম্প বাজারে ছাড়া হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এই স্ট্যাম্প ছাড়া হয়।

দৈনিক প্রচুর লোক আসতো। এসেই জিজ্ঞাসা করতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? সোজা জবাব দিতাম, 'এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি আমাদের ম্যানেজ কমিটির সদস্য হলেন। যেখানে রাত হবে, সেখানেই ঘুমাবার চেষ্টা করবেন। কেউ খেতে বললেন কোন আপত্তি করবেন না।'

কলকাতায় অনেকের বন্ধু বান্ধব রয়েছে। অনেকে আবার বাংলাদেশে থেকে গেছেন। কিছু কিছু বাংলাদেশী সেই সূত্রে আশ্রয় লাভ করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে থাকতেন কেউ কেউ। পরে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীর পাশে একটি স্কুলে ক্যাম্প তৈরী করা হয়। এমনিভাবে কলকাতা শহরে বিভিন্নভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আগরতলাতেও এমনি ধরনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আসাম ও মেঘালয়ের জীবন ছিল আরো শক্ত। শেষোক্ত দুটি রাজ্যের মানুষ তত প্রাণখোলা ছিল না।

এ সময় বৃটেনের শ্রমিক দলীয় সংসদ সদস্য ডগলাস ম্যান কলকাতা আসেন। আমার বন্ধু ডোনাল্ডের চেষ্টায় তিনি আমাদের স্বচক্ষে দেখার জন্য আসেন। ডোনাল্ড আমাকে ফোন করে বলেন, ডগলাস ম্যান এর সাথে যেন বাংলাদেশ সরকারের কারো সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেই। ডগলাস ম্যান বৃটিশ হাই কমিশনারের বাড়ীতে উঠেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি। মিঃ ম্যানও আমি বাংলাদেশের ভেতরে যাব। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে তার দেখা হবে।

তাজউদ্দিন ভাই ভোরে চলে গেলেন। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম সাক্ষাতের প্রয়োজন তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাস্টমস চেক পোস্টের কাছে প্রধানমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আমি ডগলাস ম্যানকে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করি। সেখানে মেজর ওসমানকে পাওয়া গেল।

বৃটিশ এম.পিকে নিয়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গেলাম। এই বিদেশীকে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা খুবই খুশী হলো। তারা ডগলাস ম্যান এর কাছে মুক্তিযুদ্ধে, পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বর্ণনা করেন। আমরা তাকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাদের দূত হয়ে সারা বিশ্বে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানিয়ে দেন। বৃটিশ এ.পি প্রথমে অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি আবেগে কথা বলতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পর মিঃ ম্যান আমার হাত ধরে বলেন, আমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করো। তিনি আমাদের সর্বতোভাবে সহযোগীতা করার আশ্বাস দেন। মানবিক গুণে গুণামিত পুরুষ ডগলাস তাঁর কথা রেখেছিলেন। ডগলাস ম্যান এর এই সফর এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এর সাথে সাক্ষাত এর খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাড়া জাগে, ডগলাস ম্যান ফিরে গিয়ে খবরের কাগজ, বৃটিশ পার্লামেন্ট, শ্রমিক দলের বৈঠকসহ বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট দেন।

ডগলাস ম্যানকে বিদায় করে দিয়ে কলকাতা ফেরার পথে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি যশোর অঞ্চল থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক করি। তারা খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। সেখানেও শরণার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পথে আসতে আসতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে শরণার্থীসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।

বাংলাদেশ থেকে খবর আসছে যে সর্বত্র হানাদার বাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হানাদার বাহিনী অত্যাচার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে শরণার্থীদের সংখ্যাও সেই হারে বেড়ে চলেছে। ২৫শে মার্চের পর ঢাকা থেকে যে হারে মানুষ গ্রামে চলে গিয়েছিল আজো সেই হারে বাংলাদেশ থেকে মানুষ সীমান্ত পার হয়ে আসছে।

কলকাতা ফিরে আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরীর সাথে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে আমার যোগাযোগ করে দেন। সমিতির সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বলেন পরদিন তিনি সীমান্তের দিকে যাবেন। কৃষ্ণনগর ও নদীয়া জেলা সীমান্তে। আমি গেলে নিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমি রাজী হলাম। কথা হলো, আমাকে বাংলাদেশ মিশন থেকে তুলে নেবেন। সীমান্তে যাওয়ার জন্য আমি হাতের কাজ গুছিয়ে নেই। আমার সেখানে যাওয়ার বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ সীমান্তের এই অঞ্চলে নিজের জেলা কুষ্টিয়ার অনেকের সাথে সাক্ষাত হবে। কৃষ্ণনগরে গিয়ে দেখি, স্থানীয় সমাজকর্মীরা এক বাড়ীতে অফিস করেছে। সে দিন সেখানে শরণার্থী সমস্যার সমাধান ও মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৈঠকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রফেসর দিলীপ চক্রবর্তী বৈঠকে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাকে পেয়ে তারা খুশী হন। আমি সমাবেশে আমাদের সংগ্রাম, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন অধিবাসীদের কাছ থেকে কি আশা করি তাও জানালাম। ছোটবেলায় দাদুর মুখে শোনা কৃষ্ণনগর, 'পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর' আজ স্বচক্ষে দেখলাম। বাংলাদেশের ভিটে মাটি হারা মানুষ আসছে। কিন্তু ওপারের জনগণ আঁতকে উঠেনি। ভাত্ত্বের বন্ধন সুদৃঢ়

বলেই এপারের মানুষ ওপারের ভাগ্যাহত মানুষদের আশ্রয় দিচ্ছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসলে চুয়াডাঙ্গার সকল কর্মী ভাইয়েরা আমার সাথে কোলাকুলি করেন। এদের মধ্যে মিছকিন মিয়া, ফকীর মোহাম্মদ, ডাঃ নজির আহমদসহ আরো অনেকে ছিলেন। তাদের মুখে অনেক কথা শুনলাম। আমি তাদেরকে বললাম, এদেশে আমরা যেন বাস্তবহারা হয়ে না যাই। এই যুদ্ধে সকলকে অংশ নিতে হবে। যিনি অস্ত্র হাতে নিতে পারবেন, তিনি প্রশিক্ষণ নেবেন। আর যিনি তা পারবেন না, তাকে সহকারী হিসেবে যুদ্ধের সামগ্রী বহন করতে হবে। সকলকে একত্র থাকতে হবে। যা পাই তা ভাগ করে খেতে হবে। আমি তখন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়াও জেলার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এরপর আমি কয়েকদিন ধরে জেলার দলীয় কর্মীদের খুঁজে বের করি। চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক (বর্তমানে কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ নেতা) মীর্জা সুলতান রাজা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুষ্টিয়া আওয়ামীলীগ সংগঠনের ব্যাপারে তিনি আমাকে সক্রিয় সহায়তা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁকে খুঁজে বের করি। মীর্জা সুলতান, আবুল হাশেম, ডাঃ নাজিরসহ আরো অনেকে মিলে একটি বাড়ীতে একটি ক্যাম্প গড়ে তুলেছে। বিভিন্নভাবে তাঁবু, খাবার ও রান্নার জিনিসপত্র যোগাড় করা হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি বিশেষ করে দিলীপ চক্রবর্তী এ ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করেন।

এমনিভাবে বয়রা, মামা ভাঙ্গে, কৃষ্ণনগর, শিকারপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে ছোট ছোট ক্যাম্প গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে শিকারপুরের অবস্থা অতি করুণ। কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালি, রাজবাড়ী ইত্যাদি অঞ্চলের লোকজন এখানে জমা হয়েছে। একটি ছোট গুদাম ঘর স্থানীয় লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে সকল রাজনৈতিক কর্মী স্থান নিয়েছেন। কুষ্টিয়ার আবদুল হামিদ, আজিজ মিয়া, আবুল কালাম, জলিল সবাই এখানে স্থান নিয়েছেন। এক হাটু পানি দিয়ে এই গুদাম ঘরে যেতে হয়। কোন রকমে ছাউনি দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটিতে বিছানা পেতে থাকতে হচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যে থেকেও এদের মনোবল ও উদ্দীপনা কমেনি। কিভাবে দেশ স্বাধীন হবে, এই যেন তাদের সবসময়ের চিন্তা। মেহেরপুরের এম.পি এ মহিউদ্দিন, এম.পি এ নুরুল হক, জলিল এদেরকেও খুঁজে পেলাম। তারা একটি পাটের গুদামে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের সকলের চিন্তায় এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে এক পরিবারভুক্ত তা বিপদের দিনে বুঝা যায়। কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। যা পাবে, তা সকলে মিলে ভাগ করে খাবে এমনি মনোভাব গড়ে ওঠেছে। সীমান্তে র বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে যেতো। কোন কোন দিন রাত ১২টার দিকে কলকাতা ফিরতাম। দিনের বেলা অফিসে আর রাতের বেলা সীমান্তে এই ছিল নিত্যদিনের কাজ। প্রধানমন্ত্রীকে প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ণ মনে হতো। নকশালীদের তখন চরম দাপট। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট অঞ্চলে তাদের তৎপরতা চলছে। তেমনি কলকাতায়ও। ২/১ ঘন্টা ঘুমিয়ে উঠে পড়তাম। সকালে নাশতার টেবিলেও তাজউদ্দিন ভাই এর সাথে

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। ১২/১টার মধ্যে মিশনে গিয়ে কাজ শেষ করতাম। এরপর হোসেন আলীর সাথে দুপুরে খাওয়া সেরে নিতাম। হোসেন আলীর স্ত্রী ডাল ভাত পাক করতেন। বিদেশ থেকে পাওয়া চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত সার ও প্রেস ক্লিপস প্রধানমন্ত্রীকে দিতাম। দুপুরের খাওয়া শেষ করে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হতাম।

ইতিমধ্যে শরণার্থী সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করলো। সীমান্তের কাছাকাছি ভারতের কয়েকটি রাজ্যের স্কুল কলেজ গুলোকে বন্ধ করে দিতে হলো। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা এগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে শরণার্থীদের সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা এত ব্যাপক যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ ছাড়া এর সমাধান সম্ভব ছিল না। ভারত সরকার চাল, ডাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন কিন্তু রান্নার হাড়ি, পাতিল, বাসন কোসনের অভাব রয়েছে। পায়খানা প্রশ্রাব করার স্থানেরও অভাব। পানির ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। এই অবস্থার জন্য আশ্রয়দাতা ও আশ্রিত কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন শিবিরে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা এসব সমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টা করছে। কোন কোন শিবিরে কলেরা, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি রোগ দেখা দিয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দীর্ঘ সীমান্ত পথ পাড়ি দিয়ে শিবিরে এসে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনাহার ও রোগের বেশী শিকার হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। এমনও ঘটনা ঘটেছে মা মৃত শিশুকে সৎকার না করে পথিমধ্যে ফেলে এসেছে। অনাহার ক্রিষ্ট মানুষের আহার বিশ্রাম প্রয়োজন। শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থা দেখে চোখের জল বাধ মানেনা। কিন্তু দুরবস্থার মধ্যে থেকেও মানুষের মনোবল কমেনি। কলকাতার বন্ধুদের আমাদের এই দুরবস্থার কথা জানাই। বিভিন্ন ত্রাণ সমিতির সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে।

মৈত্রেয়ী দেবী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির আহবায়িকা। তিনি ছোট্ট একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করেছেন। রবী ঠাকুরের দুই ধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী বাংলার মানুষের দুঃখের দিনে এগিয়ে এলেন। তাঁকে নিয়ে আমি বিভিন্ন শিবিরে গিয়েছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিশেষ করে শরণার্থী জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

একটি লিফলেট ছাপা হলো। লিফলেটে শরণার্থী শিবিরে থাকার নিয়ম কানুন, সর্বকর্তামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি লেখা ছিল। এটা শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সাহায্যে শিবিরগুলো পরিচালিত হয়। পরে অবশ্য এগুলোর ভরণ পোষণের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে বরিশাল ও খুলনার শরণার্থীদের শিবির তৈরী করা হয়। এমনভাবে মূর্শিদাবাদেও ক্যাম্প হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলোর শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালিত হতে থাকে।

বিভিন্ন সেক্টরে সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। আগরতলাতে খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ নিজ নিজ

পুনর্গঠনের কাজেও অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর চেয়ে বড় বিপর্যয় (সেট ব্যাক) আর কিছু হতে পারে না। আমাদের এম.পি. এম.এন.এ ও নেতাদের মনোনীত ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ওসমানীর প্রত্যাশিত 'সোনার ছেলে' পাওয়া গেল না। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তাকে এই সুযোগ দেননি। ওসমানির প্রাথমিক ধারণা ছিল তারা হয়তো তাদের দায়িত্ব পালন করেননি। কিন্তু পরে তিনি জানেন, এই দায়িত্বের ভার নিয়ে তাঁরা অন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠার জন্যে সবাই তাগিদ দিচ্ছে। এটা আমাদের পরিকল্পনার শুরুতেই প্রধান কর্মসূচী ছিল। আমার জানা মতে আমাদের নিজস্ব বেতার স্টেশন স্থাপনের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ আসার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে এতে জটিলতা দেখা দেয়। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের জট খুলতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের মিঃ রায়, মিঃ নাথ, কংগ্রেসের বহু নেতা, উপনেতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। ত্রিগুনা সেনের সাথে বাংলাদেশ মিশনে পরিচয় হয়। তিনিও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখান।

কিছু দিনের মধ্যে ব্যবস্থা হলো যে আমাদের কর্মসূচী রেকর্ড করে তা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচার করতে পারবো। আমরা বালিগঞ্জের যে বাড়ীতে থাকতাম সেখানে একটা ঘরে রেকর্ড করা শুরু হয়। একটি টেপ রেকর্ডার এর ব্যবস্থা করে তা করা হয়। কিছুদিন পর থিয়েটার রোডের একটি বাড়ীতে রেকর্ডের কাজ করা হয়। বেতার কেন্দ্র ঐ বাড়ীতে চলে যায়। আবদুল মান্নান বেতার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় বৃটেন থেকে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ আসেন। তার সাথে আসেন 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এর পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট প্রতিনিধি দল। সাথে ছিলেন ফাদার হার্ডেলসন ও মাইকেল বার্নস এম.পি। তিনি আসার আগেই আমাকে খবর দেয়া হয়। প্রতিনিধি দল সরেজমিনে শরণার্থীদের ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখেন।

আমি তাদের থাকার জন্য সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ীর তিন তলায় ব্যবস্থা করি। কিন্তু তারা সেখানে উঠেননি; তাঁরা উঠেন গ্র্যান্ড হোটেলে। সেখানে উঠেই টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। ফাদার হার্ডেলসন ছিলেন কলকাতার নিযুক্ত বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার। এই প্রতিনিধিদলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা জানতে চান কি ভাবে আমাদের সাহায্য করবেন। আমি প্রস্তাব করি, 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' নিজেরা প্রত্যেক ক্যাম্পে সাহায্য করতে পারবে না। কারণ, সমস্যা অতি ব্যাপক। তাই তাঁরা যদি বাংলাদেশী কোন সাহায্য প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা তা ক্যাম্পে পৌছাতে পারবো।

ডোনাল্ড পূর্ব থেকেই আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহী। তিনি অন্যান্য ট্রাষ্টিদের সাথে আলোচনা করে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আমার কাছে পরিকল্পনা ও বাজেট চান। আমি তা দিই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও এ নিয়ে আলোচনা হয়। শরণার্থী শিবিরের সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা ছাড়াও রাজনৈতিক ও

সমাজকর্মী যারা কোন কাজ করতে পারছে না, তাদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বাংলাদেশ জাষ্টিয়ার সার্ভিস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও এর একটা বাজেট পেশ করি। প্রধানমন্ত্রী এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তিনি এই সংগঠন করার অনুমতি দেন।

বরিশাল থেকে নুরুল ইসলাম মনজুর ও মহিউদ্দিন এম.পি. অস্ত্রের জন্য আসেন। সে ক্ষেত্রে তখন প্রচলিত প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। বরিশাল শহর ও তার আশপাশে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। তারা জানায়, অস্ত্র পেলে সেখানে তারা পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন। আমি বুঝলাম, বরিশালে যে শক্তি আছে, তাদের এদিন নিয়মিত এসে নতুন সাংগঠনিক রূপে খায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তারা তাদের সাংগঠনিক অটল। তাদের দু'জনেরই বিশ্বাস অস্ত্র পেলে তারা বরিশাল মুক্ত করতে পারবেন। মেজর জলিল এই সেক্টরের কমান্ডার। বরিশালে তিনি বীরের হাত যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে দু'নৌকা অস্ত্র ও গোলা বারুদ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত পাক চরেরা আগে ভাগে এই খবর পেয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা সাধারণতঃ আমাদের আন্দোলন সহানুভূতির চোখে দেখতেন। এদের কেউ কেউ হানাদারদের হস্ত দিতো। নৌকা ভর্তি অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সময় চব্বিশ পরগণার কোন স্থানে পাক বাহিনী এই ছোট্ট নৌকাকে এমবুশ করে। পাক বাহিনীর হামলার হাত থেকে মনজুর রক্ষা পেলেও মহিউদ্দিন ও অপর একজন শত্রুর হাতে বন্দী হন। তাদের অকথ্য নির্যাতন করা হয়। কিছুদিন পর মেজর জলিল ও নুরুল ইসলাম মনজুর দণ্ডবল নিয়ে টাকিতে এসে ক্যাম্প স্থাপন করেন।

টাকি থেকে নৌপথে খুলনা সাতক্ষীরা ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা যেতাম। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর ও সংগঠনের অবস্থা এমনিভাবে জানা সম্ভব হতো। হাজার হাজার শরণার্থী এই অঞ্চলে বসবাস করছে। এরা খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালীর শরণার্থী। এরা নৌকায় সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। দেশ চাল, ডাল, হাড়ি, পাতিল সব সাথে এনেছে। হাজার হাজার নৌকায় এভাবে লোকজন বসবাস করছে। ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে কিভাবে চেউএর সাথে এসেছে। হাজার হাজার নৌকায় এভাবে লোকজন বসবাস করছে। ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে কিভাবে চেউ এর সাথে লড়াই করছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দুঃখী মানুষের এই দুঃসাহসী মনোবল দেখে আমার মন গর্বে ভরে ওঠেছে। চব্বিশ পরগণার এমনি কয়েকটি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর আমি বহুবার গিয়েছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বেশ কিছু বিদেশী সাংবাদিক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। এরা বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা বিশ্বের জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এ সব বরণ্য সাংবাদিকদের মধ্যে পিটার হেজেল হার্ট, মিউইয়ক টাইমস-এর সিডনী সেন বার্গ, লামদের একজন সাংবাদিক ও বক্তার গ্রেনাডা টেলিভিশনের প্রতিনিধি শিলার নাম উল্লেখযোগ্য।

শিলা খুব সাহসী মহিলা। তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের চিত্র সারা পৃথিবীতে প্রচার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুক্তিযুদ্ধ কাল্পনিক কিছু নয়। এক সময় শিলাকে আমি খালেদ মোশাররফের যুদ্ধ ক্যাম্পে পাঠাই। খালেদ পূর্বাঞ্চলে এক দুঃসাহসী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে। খালেদ আমার পুরাতন বন্ধু। আমরা দু'জনেই ঢাকা কলেজের ছাত্র। আমি তখন ছাত্র রাজনীতি করি। সামরিক বাহিনীতে যাওয়ার পরেও তার সাথে আমার দুই-একবার দেখা হয়েছে। খালেদের দুঃসাহসিক বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। খালেদ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে শকিউল্লাহ, এম.এম জুনিল, রফিকুল ইসলাম, ওসমান চৌধুরী, নুরুজ্জামান, নজমুল হুদা, তওফিক, মাহবুবসহ আরো অনেকের ভূমিকা ছিল অনন্য।

শিলা খালেদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রায় এক সপ্তাহ বাংকারে বসে ছবি তুলেছেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেন, আমি যা দেখেছি, এতে জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। পৃথিবীর কোন শক্তি এই অদম্য স্পৃহা দমাতে পারবেনা। শিলা খালেদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনভাবে টেলিভিশন স্ক্রিনে বিদেশী প্রতিনিধি নিয়ে বহুবার রণাঙ্গনে গেছি। একদিন বয়রার কাছে একটি ক্যাম্পে যাই। ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ঐ ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন।

একটু পানি ভেঙ্গে শিবিরে যেতে হয়। কয়েকদিন পূর্ব থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি কোথাও কোন শুকনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। ছেলেদের গায়ের কাপড় ভিজে গেছে। আমরা সবাই শীতে থর থর করে কাঁপছি। বিকেল ৩/৪টা বেজে গেল, তবু তাদের খাওয়া হয়নি। ভেজা কাঠে তাদের রান্না করতে হলো। শুকুও হুদা কোন অভিযোগ করলেন না। ফেরার সময় হুদা শুধু বললেন, কিছু মশারী দিতে পারলে ভাল হয়। মশার খুবই উৎপাত। পরদিন দিলীপ চক্রবর্তীর কাছে মশারী চাইলাম। তিনি কয়েকশ মশারীর ব্যবস্থা করে দিলেন। দুই দিন পর ঐ মশারীসহ ক্যাম্পে যাই। সেদিন পরনে লুঙ্গি ছিল। ঐ ক্যাম্পে পৌঁছাতে কোন অসুবিধা হলো না। হুদার সাথে অনেক আলোচনা হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের পর দেশে পাঠানো এবং দেশে এদের পরিচালনার ব্যাপারে নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি এসব নিয়ে পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আবেদন জানাই।

বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় বহু অধ্যাপক, শিক্ষক এসেছেন। এঁদের মধ্যে ডঃ সারওয়ার মুরশিদ, বেগম নুরজাহান মুরশিদ, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ খদেশ বোস এর সাথে কথা হলো। আমার কিছু কাজ তাদের কারো কারো মধ্যে ভাগ করে দিলাম। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বিবৃতি তৈরী করার দায়িত্ব ডঃ সারওয়ার মুরশিদ ও ডঃ আনিসুজ্জামানকে দিলাম। তারা খসড়া তৈরী করতেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে এগুলোর চূড়ান্ত রূপ দিতাম। ডঃ মল্লিককে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব হলো। তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে শিক্ষক সমিতি গড়ে ওঠে। (স্কুল) শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান এই শিক্ষক সহায়ক সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। বন্ধু মঈদুল হাসানও

কলকাতা আসলেন। তাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কয়েক দফা বৈঠক হলো। তিনি দিল্লী চলে গেলেন। সেখানে নেপথ্য থেকে তিনি আমাদের পরি সৃষ্টি করেন।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বন্দকার মোশতাক আহমদ কোন কাজেই হাত দিয়েছেন না। মাহবুবুল আলম চাষী ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে আগরতলা থেকে কলকাতা আসার জন্য মোশতাক চাপ দিয়েছেন। মোশতাক এর দাবী অনুযায়ী তাদের দু'জনকে কলকাতা আনা হলো। চাষীকে মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্র সচিব এর পদে নিয়োগ করেন। আমি বুঝলাম, আমার মাধ্যমে বিদেশের সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে যোগাযোগ হচ্ছিল, তাতে মোশতাক খুশী হতে পারেননি। চাষী কাজ শুরু করেছেন। মোশতাক এরপর দাবী করলেন, বাংলাদেশ মিশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোন বিভাগ থাকতে পারবে না। এতদিন আমি বাংলাদেশ মিশনে কাজ করেছি। মোশতাকের এই নতুন দাবীর অর্থ বুঝতেও আমার অসুবিধা হলো না। অর্থাৎ আমাকে সার্কাস এভিনিউয় পররাষ্ট্র মিশন থেকে তাড়াতে হবে।

ঘিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আমার বসার ব্যবস্থা করা হলো। আমার পরিবার না আসা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও আমি একটি ঘরের দুইটি চৌকিতে থাকতাম। ঘিয়েটার রোডের বাড়ীটি বেশ বড়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবার না আসা পর্যন্ত তিনিও এখানে থাকতেন। এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, বন্দকার মোশতাক ও কামরুজ্জামান পৃথক পৃথক ফ্ল্যাটে ওঠেন। কিন্তু পরিবার আসার পরেও প্রধানমন্ত্রী ঘিয়েটার রোড ত্যাগ করেননি। তাজউদ্দিন তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন তিনি পারিবারিক জীবন যাপন করবেন না। তিনি বলতেন, যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধারা যদি পরিবার বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে, আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তা করতে পারবোনা কেন? তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

আমার পরিবার আসতে অনেক দেরী হয়ে যায়। ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার ছোট পরিবার ও ভাগে বিভক্ত ছিল। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে, ছেলে প্যাবলু স্ত্রীর সাথে, আর মেয়ে শম্পা (ব্যারিষ্টার তানিয়া) তার নানীর সাথে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। ২৫ শে মার্চের পর পাক বাহিনী আমার স্বত্তর বাড়ী এবং স্ত্রীর তাই মুস্তাফা সারোয়ারের বাড়ীতে আশ্রয় ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি তার নানীর সাথে মানুষের মিছিলে शामिल হয়। এরপর বহু কষ্টে স্বত্তরের পৌত্রিক বাড়ী দাউদকান্দির জামালকান্দিতে উপস্থিত হয়।

আমার স্ত্রী লীলা আমার কোন খোঁজ খবর পাননি। বাড়ীওয়ালী বেগম হাবিবুদ্দিন ওপর তলায় থাকতেন। আমাদের সাথে তার খুবই সম্ভাব ছিল। আমি তাকে খালান্মা ডাকতাম। তিনিও পুত্রবৎ হে করতেন। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর আমার স্ত্রীকে ৪ বছরের ছেলে সহ বাড়ী ছাড়তে বাধ্য করন। স্ত্রী পাশের বাড়ী নাইমুর রহমানের সাথে আমার খোঁজে মুসা সাহেবের বাড়ী যান। আমি মুসা সাহেবের বাড়ীর ছাদের যে ঘরে থাকতাম, সেখানের একটি চৌকিতে একটি রক্তাক্ত চাদর ছিল। আমার স্ত্রী এই চাদর দেখে ফেলেন। ২৫শে মার্চ রাতে সেই চৌকিতে গাড়ী চালক ঘুমিয়েছিল। হানাদবাদের গুলিতে নিহত হয়। এরপর লীলা আমার খোঁজে স্বত্তরবাড়ী নারায়ণগঞ্জে রওয়ানা হন।

কিন্তু তিনি সেখানে যেতে পারেননি। ফজলুল পাক বাহিনী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখে। ফিরে এসে তিনি দু'একজন আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও যান। কিন্তু অনেকেই সেদিন তাকে ভাল চোখে দেখেননি। তবে কোন এক সাহসী সহৃদয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার স্ত্রী প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থান করেন। সেখান থেকে ডাঃ নাইমুর রহমানের স্ত্রীর সহযোগিতায় গাড়ীযোগে তিনি নারায়ণগঞ্জে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে খুঁতর বাড়ীর কাউকে না পেয়ে নৌকা যোগে জামালকান্দিতে চলে যান। তখনো আমার মেয়ে সেখানে পৌঁছেনি। নদীর প্রায় কাছাকাছি আমার খুঁতরের গ্রামের বাড়ী। মিলিটারীর হামলার আশংকায় আমার পরিবারের লোকজন ভয় ভীতির মধ্যে সেখানে অবস্থান করেছে। হানাদারদের গান বোটের হামলার আশংকায় আমার অন্তঃসেতু স্ত্রীকে গ্রামান্তরে দৌড়াতে হয়েছে। তা'ছাড়া তিনি তখনো জানতে পারেননি আমি কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছি। আওয়ামী লীগের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী রহমত আলীর কাছে খবর পেলাম আমার স্ত্রী জামালকান্দিতে রয়েছেন। রহমত আলীর কাছে তাজউদ্দিন ডাই এর পরিবারের খবর পাওয়া গেল। রহমত আলী জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে নিয়ে আসবেন। আমি রহমত আলীর কাছে চিঠি দিলাম। রহমত আলী প্রথমে তাজউদ্দিন ও জুন মাসের দিকে আমার পরিবারের লোকজনকে কলকাতা নিয়ে আসেন।

মে-জুন মাসের দিকে আগরতলা গিয়েছিলাম। সেখানে আমার স্ত্রীর বড় ভাই আওয়ামী লীগ নেতা এ কে এম শামছুল্লাহ তার পরিবার পরিজন নিয়ে আসেন। তাঁদের কাছে আমার পরিবারের খোঁজ খবর পাই। আমার পরিবার যখন কলকাতায় পৌঁছেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতে পারিনি। বিএসএফ এর মিঃ চট্টপাধ্যায় একটি কার্গো বিমানে করে তাঁদেরকে আগরতলা থেকে নিয়ে যান। বি এ স এফ এর ভাড়া করা বাড়ী কোহিনুর ম্যানসনে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এসময় আমি খুবই ব্যস্ত। আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি প্রচলিত সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছিল।

প্রথম থেকেই মন্ত্রীসভার প্রতি আমাদের যুব সমাজের একটা অংশের বিরূপ মনোভাব ছিল। তারা মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করছিলেন। যুবকদের এই অংশের কাজ ছিল বিভিন্নভাবে সরকারকে অপদস্থ ও হয়রানী করা। তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পর্যন্ত মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব সম্পর্কে কুৎসা ও ভুল তথ্য পরিবেশন করে। অপপ্রচারের অংশ হিসাবে তারা প্রচার করে যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের প্রতি অধিকাংশের সমর্থন নেই।

এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য নেতাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কারণ এমন একটি বৈঠকই প্রমাণ করতে পারে যে তাজউদ্দিন সরকারের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের শুধু সমর্থনই নেই, এ পর্যন্ত তাঁর সকল কার্যক্রমের প্রতিও তাঁদের অনুমোদন রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির জঙ্গলে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। নদীর পাশে পাহাড়িরা এলাকার এই জঙ্গলে বৈঠকের জন্য অনেকগুলো তাঁবু টানান হয়। নির্বাচিত সদস্য ও দলীয় নেতাদেরকে বৈঠকে একত্রিত করার ব্যাপারে বিএসএফ এর চট্টপাধ্যায়

বিরাট অবদান রয়েছে। বৈঠকে খোলাখুলিভাবে সরকারের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করা হয়। এতদিন যারা তাজউদ্দিন সরকারের অপপ্রচার করেছিল, বৈঠকের ফলে তাদের মুখে ছাই কালি পড়ে। শিলিগুড়ির বৈঠকের পর কলকাতা বিমানবন্দরে এসে জানলাম, আমার পরিবারবর্গ এসেছে। কোহিনুর ম্যানসনের ফ্ল্যাটে, স্ত্রী, মেয়ে ও পুত্রের সাথে মিলিত হলাম, দীর্ঘদিন পর। ফ্ল্যাটে কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে বিছানা পাতিা হয়েছে। একই ফ্ল্যাটে আমরা ছাড়াও শামছুঞ্জোহা ও মুস্তফা সারওয়ারের পরিবারবর্গ রয়েছে। জায়গার তুলনায় আমরা লোক ছিলাম বেশী। এ সময় হানাদার বাহিনীর সমর্থকরা আমার কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়ী জ্বালিয়ে দিলে তারা গৃহহারা হন। অসুবিধা হলে দেশ ছাড়ার জন্যে আমি আকবাকে ইতিপূর্বে স্বপ্ন দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দেশের মাটিতে থেকেই আমাদের জন্যে তিনি দোয়া করছেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় চাকরি সূত্রে তিনি কলকাতায় কাটিয়েছেন। তার কলকাতা আসার কোন ইচ্ছা ছিল না। বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার পরে আত্মীয় স্বজনরা এক প্রকার জোর করে আকবাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। হানাদাররা আমার বাড়ীর সকল সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। হানাদারদের গুলিতে আমার চাচী আহত হন। বাড়ীর মেয়েরা অন্যত্র আত্মীয়দের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। আকবাসহ যুবক ও অন্যান্য পুরুষ মানুষ কলকাতা চলে আসেন। ২৫শে মার্চের রাত থেকেই এ পর্যন্ত তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একত্রে থেকেছি। পরিবার আসার পর তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। তাকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া এই বিচ্ছিন্নতায় কাজেরও বিরট ক্ষতি হলো। কেননা, এতদিন দিনের কাজ শেষে রাতের বেলায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতাম। আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। তাছাড়া সকল প্রতিকূলতার ভেতর সংগ্রাম করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবন যাপন করে খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর এই শারীরিক অসুস্থতার সময় আমার কাছে থাকা খুবই প্রয়োজন। অসুস্থ স্ত্রীকে ডাঃ অমীয় ঘোষের কাছে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কাজ করে আসছেন। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে ভক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ অপুষ্টি ও অনিয়মের কারণে গর্ভজাত সন্তান বিপদমুক্তভাবে প্রসব নাও হতে পারে। অন্যান্য সদস্যদের হাঠে মাসিক যে টাকা পেতাম, তা দিতে কোন রকমে বাজার খরচ চলতো।

আমার জন্য একটি সরকারী ভীপ বরাদ্দ ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোল দিতেন বলাইদা। বলাইদা ছিলেন একজন নম করা সিনিসিটর। তার এক মক্কেলের এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টে একটি নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্প থেকে স্ত্রীপ গাড়ীর জন্যে পেট্রোল নিতাম। ৯ মাস যুদ্ধের সময় এই দফনের পেট্রোল ছিল সশ্রমে একমাত্র সহায়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জলান্তিয়ার সার্ভিস (বিভিএস) গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য, কার্যকরী কমিটি, উপদেষ্টা ঠিক করা হয়েছে। আমি নিজে বিভিএস এর চেয়ারম্যান। আমার কুলের প্রধান শিক্ষক কারিমুদ্দিন আহমদ উপদেষ্টা এবং শাহীন কুলের অধ্যক্ষ মামুনুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক।

ওয়ার অন ওয়ান্ট আমাদের প্রাথমিক কাজের জন্য টাকা দেয়। প্রত্যেক শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। ওয়ার অন ওয়ান্ট বিডিএস কে একটি জীপও দেয়। সদর স্ট্রীটে গাজা সংলগ্ন বাড়ীতে মিশনের বদান্যতায় বিডিএস এর অফিসের জন্য দুইটা ঘর পাওয়া গেল।

কৃষ্ণনগরে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সম্মেলন হয় জুলাই এর কোন এক সময়ে। শরণার্থী শিবিরে করণীয় কার্যক্রমের বিশদ বিবরণসহ পুস্তিকা ছাপানো হয়। সকাল বেলা সম্মেলনে যাত্রার পূর্বে দেখলাম, আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর। বেগম শামছুজ্জোহার সাহায্যে পাশের ক্লিনিকে তাকে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অবস্থায়ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাকে সম্মেলনে যেতে বলেন। এমনি এক অবস্থায় আমাকে সাহস দিয়ে সম্মেলনে প্রেরণের কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্মেলনে ডঃ মোশাররফ হোসেন, শিল্পী কামরুল হাসান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ আমার সান্নিধ্য হলেন। আমার বন্ধু ও রাজনৈতিক সান্নিধ্য কুষ্টিয়ার কুমারখালী কলেজের অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমদকে কৃষ্ণনগরে এই সম্মেলনের প্রস্তুতির ভার দিয়েছিলাম।

বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে স্বেচ্ছাসেবক আসেন। এদের সকলেই রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী। তবে তাদের যুদ্ধের যাওয়ার বয়স নাই। আর্ন্ত মানবতার সেবা করাই সম্মেলনে আগত সকলের উদ্দেশ্য। ডঃ মোশাররফ হোসেন সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনে বক্তৃতা ছাড়াও কিছু ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এসব পুস্তিকায় বিডিএস এর কর্মসূচী, শরণার্থী শিবিরে করণীয় কর্তব্য, স্বাধীনতার সংগ্রামে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে কিভাবে কাছে লাগানো যায় এবং স্বাধীনতার পর দেশ গঠনে এদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ ছিল। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ডঃ স্বদেশ বোস এবং শিল্পী কামরুল হাসানও বক্তব্য রাখেন।

কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পথে জানলাম, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীরা এখানে আশপাশে রয়েছে। খবর পেলাম, কুষ্টিয়ার শোকশা থানাঃ ৭টি গ্রাম পাক বাহিনী জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। একতাপুর গ্রামের কাপালিকরাও গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন। এসব গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আমাকে তাদের অত্যন্ত আপনজন জানতেন। কলকাতায় ফিরে প্রথমেই ক্লিনিকে যাই। বুকের ভিতর ছিল চাপা উত্তেজনা। ক্লিনিকে গিয়ে জানলাম, আমার পুত্র সন্তান হয়েছে। মা ও সন্তান সুস্থ আছে বলেও জানলাম। আমরা সব করে সন্তানের নাম রাখি 'জয়'। কিন্তু আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। জন্মের পর জয় আমায় রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই জয় আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অর্থাভাবে জয় এর চিকিৎসা করাও সম্ভব হয়নি। ক্লিনিকে মৃত্যুপথযাত্রী জয়কে নেয়া হয়। সেলাইন দেওয়ার কথা ডাক্তার বলেন। সেলাইন এর বিল পরিশোধ করতে পারবো কিনা, এই নিয়ে ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত ছিল। কিন্তু সেলাইন দেয়ার আর প্রয়োজন হয়নি। তার আগেই জয় চলে যায়। পুনশোকের অভিজ্ঞতা যেন কোন পিতা মাতার না হয়। আমি জয়কে নিজ হাতে মাটিতে নামিয়ে দেয়ার সময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমার জয় এর পরিবর্তে আমাদের স্বাধীনতা দিও। এই

শোক সামলে নিতে আমার প্রায় সপ্তাহখানক সময় লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর সেই স্মৃতি আজো মুছে যায়নি। তাছাড়া কোন মায়ের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ডঃ স্বদেশ বোস পরে বলে ছিলেন, সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় পথে পথে ঘুরে এবং খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে মা ও সন্তানের অপুষ্টি হয়। এই সন্তান বেঁচে থাকলেও সংশয় মুক্ত ছিল না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি প্রতিদিন শরণার্থী শিবিরে বহু শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। এরপর থেকে স্ত্রীও আমার সাথে সীমান্তে শিবির দেখতে যেতেন। এমনভাবে স্ত্রী আমার কাজের সহযোগী হয়ে ওঠেন। আমরা এ সময় বিভিন্ন শিবিরে অর্থকরী কাজে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করি। তাছাড়া প্রতি ক্যাম্পে শিশু কিশোরদের জন্যে কয়েকটি নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। প্রতি ক্যাম্পে ভোর বেলা পতাকা উত্তোলন, মুক্তিযুদ্ধের গান, পিটি, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে। ক্যাম্পগুলোতে ময়লা নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ড্রেন কাটা, নালা সাফ, আর্বজনা পরিষ্কার ও ব্রিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমাশয় রোগে বিভিন্ন শিবিরে বহুলোক মারা যায়। তন্মধ্যে শিশু মৃত্যুর হারই বেশী। ডাক্তার ও ঔষুধের প্রচণ্ড অভাব। প্রত্যেক ক্যাম্পে মেডিক্যাল সেন্টার খোলার সম্ভাবনা আমাদের নেই।

এ সময় আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের খুঁজে বের করে প্রত্যেক ক্যাম্পে নিয়োগ করি। তাদের ঔষুধের ব্যয় দেয়া হত। এতে বেশ কাজ হলো। সীমান্তের নিকট আমরা হাসপাতাল গড়ে তুলি। একজন কর্মঠ ডাক্তার এবং তাকে সাহায্যকারী কয়েকজন নার্স পেলেই হাসপাতাল গুরু করা হয়। কোন ছোট গুদাম জাতীয় স্থান নামমাত্র অর্থে ভাড়া নিয়ে সেখানে ছোট ছোট চৌকি ফেলে ১০/১২ বেডের হাসপাতাল তৈরী করা হতো। বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য সহযোগিতায় হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়।

এসব হাসপাতাল আমাদের খুবই উপকারে আসে। এতদিন পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আহত যে সব মুক্তিযোদ্ধা সামান্য চিকিৎসার অভাবে মারা যেত, হাসপাতালগুলো চালু হওয়ার পর তারা চিকিৎসা পেতে থাকে। ডাক্তারী পড়া ছাত্ররা এসব হাসপাতালে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার এম.পিদের প্রতি মাসে ২০০ টাকা মাসোহারা দিত। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এ ধরনের কোন আর্থিক সুবিধা ছিল। বিডিএস (বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস) এর পক্ষ থেকে এসব রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের মাসিক ৫০ টাকা মাসোহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুঃসময়ে এ টাকা তাদের খুবই কাজে আসে।

প্রধানমন্ত্রী আমাকে দু'বার দিল্লী পাঠান। প্রথমবার দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিভিন্ন এজেন্সীর লোকদের সাথে সাক্ষাত করা। সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখা হয়। এদের কাছে বিভিন্ন ধরনের খবর পাওয়া গেল। বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার এর সাথেও আলোচনা করি। তাছাড়া দিল্লীতে অবস্থিত বিদেশী মিশনের কর্মকর্তাদের সাথেও পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হই।

এদের সাথে সাক্ষাতের সময় আমি শুনতাম বেশী, বলতাম কম। দেশ বিদেশে আমাদের সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াসহ পরাশক্তিসমূহের মনোভাবও জানার সুযোগ হয়। ভারত সরকার সম্পর্কেও অনেক খবর জানা সম্ভব হল। হিন্দুস্তান টাইমস এর সম্পাদক উইলিয়ামস ভারগিস ও তার মত আরো অনেকে বুঝাতে চান, ভারতের সকলে যে বাংলাদেশের পক্ষে আছে বা থাকবে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই। তারা বলেন, আজো অনেকে ভাবেন যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই ভারতের জন্য মঙ্গল হবে। কারণ পাকিস্তানকে এতদিনে চেনা-জানা হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। কারো কারো ধারণা বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত যুদ্ধে পড়লে অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।

এ সময় দিল্লীতে শেখ আব্দুল্লাহর সাথেও আমার দেখা হয়। একটি বাড়ীতে আধা নজরবন্দী অবস্থায় তিনি থাকতেন। তাঁর চলাফেরার ওপর বিভিন্ন সংস্থার কড়া নজর ছিল। তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তবুও পুরো ১টা দিন তিনি আমার জন্য ব্যয় করেন। বহু দিন পূর্ব থেকেই তাঁর নাম শুনেছি। কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার চোখে তিনি বীর। ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাসে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি স্পষ্টবাদী। তিনি তার মনোভাব গোপন করলেন না। তিনি বললেন তিনি পাকিস্তান চাননি। কিন্তু বাঙ্গালীরা তা চেয়েছিল। তারা আবার আজকে বাংলাদেশ চায়। আগামীতে তারা আবার কি চাইবে, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? শেখ আব্দুল্লাহর কথাগুলো তখন আমার খুব ভাল লাগেনি। কিন্তু তার কথার ভেতরে যে ইঙ্গিত ছিল, পরে তার মর্ম বেশী করে উপলব্ধি করেছি। আমি শেখকে বুঝাবার চেষ্টা করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালী আজ সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের সংগ্রাম ৮ কোটি বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা বলতেই তিনি আবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, তোমরা জিন্নাহর পেছনেও ছিলে। নাচাটাই তোমাদের স্বভাব। আজ তোমরা বঙ্গবন্ধুর পেছনে আছ। আবার কালকে তাঁর বিরোধিতা করতেও তোমাদের সময় লাগবে না। কাজেই তোমাদের প্রতি অন্তত আমার কোন সমর্থন নেই।

সে সময় পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে এমন কিছু ব্যক্তির সাথেও আমি সাক্ষাত করি। তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতীয় সংসদে একটি প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করা হয়। মিঃ ফণীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মিসেস নুরজাহান মুরশিদ এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

আমি দিল্লী আসার আগেই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারতীয় সংসদে বক্তৃতা করেন। আমি দিল্লী এসেছি জেনে তারা আমার সাথেও যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আহৃত সাংবাদিক সম্মেলনে থাকার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হলো। সম্মেলনে পেশ করার জন্যে বক্তব্য তৈরী করে নিয়ে গেলাম। ফনী দা জানতেন বিদেশী প্রেসের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করছি। দিল্লী প্রেসক্লাবে তিনি আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলাম।

সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আহবান করি। শাহ মোয়াজ্জেম আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনো আমি ছদ্মনাম 'রহমত আলী' হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রচারিত হলো। পরিবার পরিজনের সাথে তখনো আমার দেখা হয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের মূল বক্তব্য ছিল পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবেলার অনভিজ্ঞ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে সফল হবেন এবং যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাই বা কি? উত্তরে বললাম, দেশ মাতৃকার জন্য রক্তদানে প্রস্তুত বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়াটে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করবেই। আমাদের ধারণা ছিল বর্ষাকালে পাক বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। প্রাচীন ও বন্যায় অনভ্যস্ত পশ্চিমা বাহিনী এ সময় মূলতঃ শহরে আটক থাকবে। আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনাও তেমনি ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে এরূপ ইঙ্গিত দেই। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা ছিল অন্যরূপ। পাক হানাদার বাহিনী গান বোটের সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

দিল্লী থাকাকালে অন্য একটি কাজ করি। সিপিআই এর একজন এম.পি.র মাধ্যমে দিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ হয়। সংসদীয় দলের ৩ জন প্রতিনিধি সহ আমরা ৪জন সোভিয়েত দূতাবাসে যাই। এটি পাক দূতাবাসের সামনে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রদূতের পরবর্তী কর্মকর্তা আমাদের সাথে দেখা করেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন, দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য তিনি মস্কোতে পাঠাবেন। এর বেশী কিছু তিনি করতে পারবেন না বলে জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আগ্রহী ছিলেন না। আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনে মস্কো যান। তখনো তিনি সোভিয়েতের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাক্ষাত লাভে সমর্থ হন নি।

শান্তি সম্মেলনের সময় খাবার টেবিলে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের পতাকা থাকতো। আবদুস সামাদ আজাদ সেখানে বাংলাদেশের পতাকা রাখার দাবী জানালে স্বাগতিক দেশ অসম্মতি প্রকাশ করে। এমনকি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে একটি পতাকা রাখতে চাইলে মস্কোর তা পছন্দ হয়নি। এরপর আবদুস সামাদ আজাদ নিজের ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তাজউদ্দিন ভাই সাংবাদিক মঈদুল হাসানের মাধ্যমে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন করতে মস্কোর যে অসুবিধা ছিল, সেটা আমরা বুঝতাম। তবে আমাদের সংগ্রামের প্রতি যে মস্কোর সমর্থন রয়েছে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর পাক সরকারের কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্ট পদগোপির চিঠিতে তার আভাস পাওয়া গেছে। ২৫শে মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর হামলার প্রতিবাদ করে প্রেসিডেন্ট পদগোপি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যেই সে সময়ে মস্কোর পক্ষে আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন দেয়া সম্ভব হয়নি।

তবে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দেয়ার জন্য ভারতের সাথে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করে। আমাদের সংগ্রাম চলার সময় মিঃ হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে চীন সফর করেন। আর চীন মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে পাকিস্তান দুতিয়ালী করে। এই ঘটনা ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষিত রচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও বৃহৎ শক্তির ভারসাম্যের আলোকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ বাণী কার্যে পরিণত হয়েছিল।

এসব আলোচনাকালে আমরা দু'জনেই মোটামুটি একই রকম মতামত পেশ করতাম। কিসিঞ্জারের চীন সফরের খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সফর আমাদের সংগ্রামে প্রভাব বিস্তার করবে। পরে এটা সত্যে প্রমাণিত হয়। মস্কো উপলব্ধি করে যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে রাশিয়া বিরোধী জোট গঠনে ব্যস্ত রয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চীন-মার্কিন তখন বিশেষভাবে ব্যস্ত। চীন-মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর রাশিয়া-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠতর হয়। এখন রাশিয়ার পক্ষ থেকে ভারতের একটি আশ্বাস প্রয়োজন। সেই আশ্বাসটি হলো, কোন কারণে চীন ভারতে হামলা করলে রাশিয়া যেন পাল্টা চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে, যাতে চীন নির্বিঘ্নে ভারতে ঢুকে পড়তে না পারে।

হিমালয়ের তুষার ও সোভিয়েতের বন্ধুত্ব এই দুইটি ছিল চীনের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষা কবচ। তাই সময় ও সুযোগে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ভারত যখন অপেক্ষা করছিল, সে সময় বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

দিল্লীতে আমি ভারতের বৈদেশিক দফতরে টিএন কাউলের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদেরকে বিদেশে প্রচার কাজের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেন। তিনি বিদেশের বিভিন্ন রাজধানী, সেখানকার, সরকার, সংবাদপত্র ও জনমত সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা দেন। আমি এসব দিল্লী সফরের রিপোর্ট হিসেবে একটা নক্সার মত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের সরকারগুলো কে কি ভাবছে, তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। এ ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই এর একটা মোটামুটি হিসেব ছিল। তিনি জোর দিয়েই বলতেন যে আগামী শীতেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কেননা এছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রতিদিন সীমান্ত পার হয়ে শত শত তরুণ যুবক আসছে। তাদের মুখে এক কথা-ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবক ছাড়াও প্রতিদিন বহু লোক আমাদের অফিসে সাঙ্কাত করতে আসতেন তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ভিড় করা শুরু করলেন। তাদের সবার বক্তব্য, স্ব-স্ব স্থানের ছেলেদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম, যে সংখ্যা

মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আমরা করেছি, এর চেয়ে বহু বেশী সংখ্যায় যুবকরা আসছে প্রশিক্ষণের জন্য। এ সময় আমরা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই ক্যাম্পগুলো এম.পিও আওয়ামী লীগ নেতারা পরিচালনা করেন।

এর পরের ধাপ ছিল অভ্যর্থনা শিবির। অভ্যর্থনা শিবিরের কাজ ভারতীয়রা ও আমরা যৌথভাবে পরিচালনা করতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে ছয় সপ্তাহের ট্রেনিং এ পাঠানো হতো।

প্রথমে আমাদের ২৫ হাজার গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। পরে এই সংখ্যাকে এক লক্ষে উন্নীত করা হয়। এর মধ্যে ট্রেনিং শেষ করে ৯০ হাজার স্বদেশে আসতে সক্ষম হয়। তাছাড়াও ছিল নিয়মিত বাহিনী। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিডিআর এর সৈনিকদের দ্বারা এই বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশের সংখ্যা ছিল পর্যাপ্ত।

সীমান্তে ছাউনী তৈরী করে নিয়মিত বাহিনী অবস্থান করতো। সেখান থেকেই তারা পাক বাহিনীর ওপর হামলা করেছে। তা ছাড়া ছিল সহায়তাকারী একটা গোষ্ঠী। একটু বয়স্ক, যাদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব ছিল না, তারা 'ইয়ুথ ক্যাম্প ও 'অভ্যর্থনা ক্যাম্প' নিয়মিত বাহিনীর সাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতো।

ইয়ুথ ক্যাম্প হতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়া গেল। বাংলার হাজার হাজার দামাল ছেলের দ্বারা ক্যাম্পগুলো ছিল পরিপূর্ণ। তাদের শুধু একটাই কথা ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। খান সেনাদের যে কোন মূল্যে খতম করতে হবে।

এ সময় আমি নিয়মিত ইয়ুথ ক্যাম্পে যেতাম। প্রিন্সেস স্ট্রীটে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অফিস খোলা হল। এই মন্ত্রণালয় ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কাজের মাধ্যমে ত্রাণমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সাথে আমার সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে কয়েকবার আমাদের বৈঠক হতো। এতে কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) ও আমি সড়ক পথে বাংলাদেশের পুরো সীমান্ত দেখার জন্য ২৫ দিনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করি। স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল খালেক আমাদের সাথে ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে খালেক রাজশাহীতে ছিলেন, পরে সীমান্ত পার হয়ে আসেন। আবদুল খালেক পুলিশ বাহিনীর লোকদের সংঘবদ্ধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক। তাঁর উদ্যম ও কর্মোৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী। আমরা রওয়ানা হই কলকাতা থেকে। মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরে শিলিগুড়ি পার হয়ে মেঘালয়ের পাহাড় অঞ্চলের পাদদেশে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি। ফিরে আসার সময় পথে পথে সকল ক্যাম্প পরিদর্শন করি।

আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হতো ইয়ুথ ক্যাম্পে। ইয়ুথ ক্যাম্প ছাড়াও পশ্চিমঘাটে নিয়মিত ক্যাম্পগুলোতে গেছি। আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সরেজমিনে দেখা এবং স্থানীয় ও ভারতীয় প্রশাসন যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। তোরাতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হলো। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। মেঘালয়ের জনগণের অধিকাংশ খ্রীষ্টান। তারা

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। মিশনারীদের পুরাতন প্রভাব বিদ্যমান। এখানে পশ্চিমবঙ্গের মত সহায়তা এত ব্যাপক নয়। আমাদের লোকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

মেঘালয় সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনা হলো। হেনা ভাই এর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্র জীবনের সম্পর্ক ছিল। আলোচনায় এই সম্পর্ক আরো গভীর হলো।

এখানেই মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। খবর পেয়ে তিনি ডাক বাংলাতে আমাদের সংগে দেখা করতে আসেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর থেকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অফিসারের একটা গ্রুপ তৈরীর ভার ছিল জিয়ার ওপরে। কয়েকদিন পূর্বে জিয়া সৃষ্ট আমাদের শিক্ষানবীশ গ্রুপটিকে পাক বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করাও আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম। সেই পরিত্যক্ত ক্যাম্প সার্ভে করি। সব কিছু শুনে মনে হলো শত্রুর মুখে শিক্ষানবীশ অফিসাররা নিতান্তই নিরাপত্তাহীন ছিল। এত বড় আঘাতের রেশ তখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। মেঘালয়ের কাজ শেষে আমরা শিলিং এর পথে রওয়ানা হই। পাহাড়ী পথ বেয়ে আমাদের গাড়ী চলতে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চলে রাতের বেলা শীত বাড়ে।

জঙ্গলে ক্যাম্প স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ক্যাম্পে শত্রু হানার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। রাতের বেলা এমন একটি ক্যাম্পে গিয়ে আমরা উপস্থিত হই। পরিত্যক্ত বাড়ীতে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। চালা দেয়া ঘর এবং কয়েকটি তাঁবু রয়েছে। ছেলেরা তখন আগুন পোহাচ্ছিল। শীতের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় নেই। পাহাড়ী অঞ্চলে খাওয়া দাওয়ার এমনিতেই অসুবিধা। যোগাযোগের অবস্থাও ভাল নয়। এই অবস্থায়ও মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে অম্লান হাসি। তাদের সাথে অনেকক্ষণ খোলাখুলি কথা হয়। কারো কারো প্রশ্ন, স্বাধীনতার পর দেশকে কিভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে ইত্যাদি। তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করি। তারা জানান, তাদের প্রয়োজন শুধু অস্ত্রের। তাদের অভাবের তালিকায় শীতবস্ত্র, জুতা, কম্বল ও খাওয়ানাহ অনেক কিছু ছিল। কিন্তু তারা এসবের কিছুই উল্লেখ করেনি। তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ দাবী হলো অস্ত্র চাই। শত্রুকে হত্যা করে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

সারারাত গাড়ী চালিয়ে আমরা পথ অতিক্রম করে পরদিন সিলেট সীমান্তে আসি। পথে পথে বহু শিবির আমরা পরিদর্শন করেছি। সিলেটের কিছু অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রয়েছে। হেনা ভাই এর খুব ইচ্ছা বাংলার মাটিতে রাত কাটাবেন। বর্ষার পানিতে সিলেটের হাওড় তখনো পরিপূর্ণ। আমাদের আসার খবর চারদিকের গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট নৌকায় আমাদের দলীয় নেতা-কর্মীরা দেখা করতে এলেন। নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় বিএসএফ কর্মকর্তার সাথে আলোচনা শেষে শিলিং এর পথে যাত্রা করি।

এখানে মুক্তাঞ্চলে বহু শরণার্থী শিবির রয়েছে। রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির। এখান থেকে গিয়ে তারা হানাদারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। একটি গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে বিরাট জনতার সমাগম হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আমরা বক্তৃতা করি। স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রকাশ্যে জনসভা করতে পেরে অফুরন্ত

আনন্দ পেলাম। জনসভা শেষে রাতেই আমাদের শিলং পৌছার কথা রয়েছে। এই অঞ্চলে সিলেটের একজন এম.পি আবদুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

সেখান থেকে আমরা শিলং ডাক বাংলাতে যাই। সিলেটের একজন এম.পি এই অঞ্চলে প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন। এই এম.পির নাম ব্যারিস্টার মোনতাকিম চৌধুরী পরে তাকে জাপানের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। এখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েকটি বৈঠক করি। পরদিন আমরা সিলেট ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত 'বালাট' এর পথে রওয়ানা হই। কিছুদিন পূর্বে বালাটের কাছে পাক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আমাদের কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের মাটিতে এই বীরদের কবর দেয়া হয়েছে। বালাটেও স্থানীয় নেতাদের সাথে আমাদের কয়েক দফা বৈঠক হয়।

আমাদের ফেরত যাত্রা শুরু হল। শিলং এ পৌঁছে দিনের কর্ম ব্যস্ততা শেষ করে পশ্চিম বাংলার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের বাসায় যাই। তার কাছ থেকে স্থানীয় রাজনীতি, আসাম ও মেঘালয় সরকারের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হই। এর পূর্বে আমি কয়েকবার, গৌহাটি, আগরতলা ঘুরে গেছি। আসাম সরকার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না। শরণার্থী শিবিরগুলোতে খুবই কড়াকড়ি। তাই তাদের জীবন এখানে খুব সুখকর ছিল না।

এর আগে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে নিয়ে আমি আগরতলা গেছি। তাকে নিয়ে আমি সাবরুমে গেছি। এখানে ওপারে বাংলাদেশ সীমান্তে একটি রেস্তোরাঁ হাউজে রয়েছে। সেখানে হানাদার বাহিনী ক্যাম্প তৈরী করেছে। পাক হানাদার বাহিনী এখানে নারী নির্যাতন করেছে। দস্যুরা নারীদের উলঙ্গ করে পর্যন্ত রাখে। ওপরের লোকের মুখে এসব নির্যাতনের কথা আমরা শুনি। সাবরুমে ডাক বাংলাতে বিশ্রামের সময় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারীর সাথে আমাদের দেখা হয়। বারী একজন সাধারণ শরণার্থীর মত ডোনাল্ড এর কাছে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। ডোনাল্ড এসব কথা ব্রিটিশ সংসদে বলবেন বলে আমাদের জানান। এবং তিনি পরে তা করেছিলেন। হ্যানসার্ড এর রিপোর্ট বাংলাদেশের এই করুণ আলোচ্য প্রকাশিত হয়। আমি জন স্টোন হাউজ, ডগলাস ম্যান, পিটার বার্নস, এম.পিসহ অনেক সাংবাদিককে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে পৌঁছি। এমন একটি দল নিয়ে পাটগ্রামের মুক্তাঞ্চলে যাই। যুদ্ধ চলার সময়েও আমি বহুবার পাটগ্রাম গেছি। পাটগ্রামে একবার আমরা একটি ডাকঘর উদ্বোধন করি। এ সময় প্রখ্যাত ডিজাইনার বিমান বোস অংকিত স্বাধীনতা যুদ্ধের কোমেমোরেটিভ স্ট্যাম্প লগুন ও কলকাতায় বিক্রি করা হয়।

পাটগ্রামে ডাকঘর উদ্বোধন করার সময় টেলিভিশনসহ বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং মুস্তফা সারওয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পাটগ্রাম থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাই। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমরা ১ রাত ১ দিন কাটাই। সামরিক ছাউনীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আমরা দিনাজপুরের পঞ্চগড় পর্যন্ত মুক্তাঞ্চলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নিই। আমাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কামান বিপুল উৎসাহে গর্জে ওঠে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে তখন কামান এসে গেছে। এই কামানের গোলায় দূরের পাকিস্তানি বাংকারগুলো ভেঙ্গে পড়ছে। দূরবীণ দিয়ে পলায়নপর পাক বাহিনী দেখে উল্লসিত হই।

দিনাজপুর জেলায় এই অঞ্চলের একটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসী মুক্তিবাহিনীর জন্যে গ্রামটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। গ্রামটির নাম মনে নেই। গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ী ঘরে টিনের বা ঝড়ের চালা। ঘরের ভিটিগুলো বেশ উঁচু। ঘরের ভিতরে বাংকার তৈরী করা হয়েছে। মেঝেতে গর্ত করে মাটির ভেতরে কামান বসানো হয়েছে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সেই উদাস্ত আহবান ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল এ কথা মনে হতো। গোরস্থানে কবরের ভেতরেও অনেক স্থানে বাংকার হয়েছে। গ্রামবাসীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করছে। ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা দূরে গরু চরাতে গিয়ে পত্র বাহকের কাজ করছে ও দূরে শত্রুদের অবস্থান জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ভিয়েতাম যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভিয়েতনামের জনগণ পরম পরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের মাটিতে একাধিক বীরত্ব গাঁথা জন্ম নিচ্ছে। এই বীরত্ব গাঁথার সবগুলো হয়তো কোন দিনই লেখকের কলমে, কবির কবিতায় বা শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যাবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে হয়তো কোন দিনই লেখা হবে না। তবে ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহস দেখে মন ভরে উঠতো। প্রথম প্রথম বেশ ভয় করতাম। পরে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাই। একদিন ভারতীয় একজন জেনারেলের কথা শুনে আমার ভয় অনেকটা কমে গেল। তিনি বলেন, যে গুলিতে তুমি মারা যাবে, সে গুলির আওয়াজ তোমার কানে আসবেনা। আর যে গুলির শব্দ তুমি শুনছ, তা তোমার গায়ে লাগবেনা। এরপর বলতে গেলে গুলির শব্দে আর ভয় পাইনি। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আমি যুদ্ধের নিয়ম কানুন কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি। তাছাড়া কোন ক্যাম্পে গেলে আমাদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। আর বিশেষ কথা হলো আমাদের তখন মরবার ভয় ছিল না, ভয় ছিল শত্রুর হাতে যেন না পড়ি। শত্রুর হাতে না পড়ার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। কারণ, যুদ্ধাবস্থায় বন্দিত্ব মৃত্যুর চেয়ে খারাপ হতে পারে। সে সময় পঞ্চগড়ের একটা সেতু মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। সেতুর স্থান থেকে ঢাকার মাইল ষ্টোন দেখা যায়। ভাবতাম, এই পথে কখন ঢাকা যাব। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মুক্তাঞ্চলগুলো ছিল আমাদের দিনের মাইল পোস্ট।

প্রধানমন্ত্রী ও আমি পাটগ্রাম সফর করে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি। শিলিগুড়ির মিলিটারী হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পেলাম। আহতদের মুখে মুক্তিযুদ্ধে তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনলাম। তাদের চোখে মুখে দেশে ফেরার স্বপ্ন শিলিগুড়ির একটি কাকর বিছানো পথ দিয়ে আমরা পাটগ্রাম যেতাম। পাটগ্রামের পরিত্যক্ত রেল স্টেশনে বসে বাংলাদেশ যুদ্ধে সহায়তাকারী ডোনাল্ড ও স্টোনহাউসকে বাংলাদেশে প্রবেশের ভিসা প্রদান করি। শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক

কর্মচারীদের একটি প্রশাসন কাঠামো ছিল। গণ সংযোগের জন্য আমি একবার শিলিগুড়ি বারে যাই।

প্রধানমন্ত্রীর সাথেও একবার শিলিগুড়ি যাই। সারাদিনের কর্মসূচী ছিল। এবার চিন্তদের বাসায় যেতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলায় শিলিগুড়িতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মিলিটারী ক্লাবে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। এই অঞ্চলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান, তার সঙ্গী সাথী কর্মকর্তারা সকলে উপস্থিত। তাদের ব্যবহার খুবই ভাল। তাদের আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষভাবে পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। তা হল ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা। গণপ্রতিনিধিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাভাব দেখে আমার খুব ভাল লাগলো। বুঝলাম, সে দেশে কেন গণতন্ত্র টিকে আছে।

পরদিন সকালে আমরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলাম। এগুলো ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি শিক্ষানবিশ মুক্তিযোদ্ধারা টার্গেট গুটিংএ ব্যস্ত। মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ শেষে লাইন করে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। জয় বাংলা শ্লোগানে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত ক্যাম্প কেঁপে ওঠে। আমাদের সবার কণ্ঠে ভেসে আসলো ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’।

ক্যাম্পের সীমানার শেষ প্রান্তে এসে ছেলেরা আমাদের বিদায় দিয়ে গেল। এখান থেকে আমরা রংপুরে ভুরুঙ্গামারীর দিকে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে ভারতের একজন বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী রয়েছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলেছেন। পেছনে একটি জীপে সেই ক্যামেরাম্যান। আমাদের সাথে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাপন সচিব নুরুল কাদের খান, আলোকচিত্র শিল্পী আলম সহ আরো কয়েকজন সাংবাদিক। ভুরুঙ্গামারী পৌঁছে জানলাম, এই অঞ্চলে একজন জজ (নাম সম্ভবতঃ আনোয়ার) যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

পরদিন আমরা আবার মুন্সীগঞ্জে যাই। এ সময় আমাদের মাঝে মধ্যে খাল, বিল, খরস্রোতা নদী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উড়িয়ে দেয়া সেতু পার হতে হতো। একদিন প্রধানমন্ত্রী ও আমি কলা গাছের ভেলায় করে একটি খাল পার হই। এই ভেলাসহ আমাদের ছবি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য বইএ এই ছবি প্রকাশিত হয়।

এই সফরসূচীতে আমরা বিভিন্ন মুন্সীগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত ছুঁইয়ে আগরতলা পৌঁছি। কঠিন দুর্গম ও পাহাড়ী পথ। আগরতলা, সাবরুম, হরিনা, বালটি, তোরা, ভুরুঙ্গামারী, পাটগ্রাম, পঞ্চগড়, রাজশাহী, বেতায়, শিকারপুর, মুজিবনগর, বেনাপোল, মামা ভাগ্নে, টাকি, দেবহাটা এগুলো ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাইল পোস্ট। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের মানচিত্রকে মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। সীমান্তের ওপারে এক কোটি মানুষের ভিড়। এরা গৃহে ফিরতে আগ্রহী। শৃঙ্খল মুক্তির উন্মাদ আবেগ তাদের মনে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাবনের মত সারাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা বাংলার নিভৃত গ্রামে, অরণ্যে, মাঠে, নদী-খাল-বিল, হাটে-ঘাটে, বাজার ও শহরের পাড়াতে ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ভরসা করে রয়েছে। এরা ঢাকার ইন্টারকন থেকে মতিঝিল আবাসিক এলাকা, ফার্মগেট, মফস্বল শহরের রাজপথ, গঞ্জে বাজারে, ধানক্ষেতে, রাজাকারের ক্যাম্প, দালানের গৃহে, হানাদার বাহিনীর ছাউনীতে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আগরতলায় এসে আমরা মেজর শফিউল্লাহর সাথে মিলিত হলাম। শফিউল্লাহ হরিনাতে ক্যাম্প স্থাপন করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধে পরিচালনা করে আসছেন।

আমরা মেজর খালেদ মোশাররফের ক্যাম্পও গেলাম। ক্যাপ্টেন রফিক খুব শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেকদিন পর তার সাথে দেখা। ইয়াহিয়ার শাসনামলে তিনি কুষ্টিয়ায় ছিলেন। দু'সপ্তাহ পূর্বে তিনি ফ্রন্ট থেকে ফিরেছেন। কয়েকদিন পূর্বে তার জ্বর হয়েছিল। জ্বর থেকে সেরে উঠেছেন। যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি উদগ্রীব। এই ক্যাম্পে সবার সাথে মাটিতে বসে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দিত। পাক সেনাবাহিনী তখন আগরতলা সীমান্তে দারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে। তাদের গোলা সীমান্ত পার হয়ে শরণার্থী শিবির পর্যন্ত আসছে। হানাদারদের হটাবার জন্যে আমাদের মুক্তিবাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই সময় চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী ও এম, এ হান্নানের সাথে দেখা হলো। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করি। আগরতলাতে জনসংখ্যার চেয়ে শরণার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। ফেরার পথে মালেক উকিলের সাথে দেখা হলো। এখানে ছোট্ট পরিবার নিয়ে তিনি থাকেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যেখানে যান সেখানেই বিপুল লোকের সমাগম হয়। তাদের দু'জনের আগমনে এখানে প্রাণচাঞ্চল্য বয়ে গেল।

পরদিন সকালে আমরা খালেদ মোশাররফের ক্যাম্প গেলাম। খালেদ আমাদের জানান, এই মুহূর্তে তিনি আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারছেন না। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক তিনি অবরোধ করে রেখেছেন বলে আমাদের জানান। তার লোকজন অনেক গভীরে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছে। আমাদের নিয়ে তিনি জঙ্গলের পথে বের হলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ভারতীয় সীমান্তের সাথে লাগানো। এই গ্রামের মানুষের সাথে আমাদের মুক্তিবাহিনীর একটা সখ্যতা স্থাপিত হয়ে গেছে। পুকুর থেকে গ্রামের মেয়েরা পানি নিচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে চলাচল করছে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। গ্রাম থেকে একটু দূরে আম বাগানের ভেতরে বৃহৎ কামান বসিয়ে গোলা ছুঁড়ছে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী। এই কামানগুলো খুব পুরানো আমলের বলে মনে হলো। এগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। খালেদ আমাকে কামানের সামনে নিয়ে গেল। আমার মাথার ওপর দিয়ে কামানের গোলা উড়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক উত্তেজনার শিহরণ। এরপর খালেদ পাহাড়ে ওঠার জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমাদেরকে শত্রুর শিবির দেখানোর কথা বললেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে না নিয়ে যেতে পারলেও সড়কটি আমাদের দেখাতে চাইলেন। কটকাকীর্ণ পথ। খালেদের চাল চলন দেখে মনে হলো, তিনি যেন এখানে মানুষ হয়েছেন। তার কাঁধে একটি দূরবীণ, পায়ে বুট এবং হাতে একটি ছোট্ট ছড়ি। আমাদের হাতেও এমনি করে লাঠি দিয়েছেন

পথ চলার সুবিধার জন্যে। আমার উঠতে কোন অসুবিধা হচ্ছিলনা। নজরুল ভাইকে নিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পাহাড়ে উঠে দূরবীণ দিয়ে খালেদ কি যেন দেখলেন। এক সময় খালেদ পাক-ছাউনি দেখালেন। আমি দেখলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কও দেখলাম। রাস্তাটি একেবারে জনমানবহীন।

আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী তখনো গোলাবর্ষণ করছে। শত্রু বাহিনীর ছাউনির কাছে সেই গোলা গিয়ে পড়ছে। শত্রু ছাউনির পাশে একটি রেষ্ট হাউজ দেখা যাচ্ছে। খালেদ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। কতক্ষণ পরে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জোয়ানদের সাথে খেলেন। ইতিমধ্যে গাফফার (অবসর প্রাপ্ত লেঃ কর্নেল) একটি ছোট বাহিনী নিয়ে আসেন। গাফফার অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। বাড়ী খুলনা। অসম সাহসী, ধীর, স্থির। একটা ভাল লাগার মত ব্যক্তিত্ব। তার কাছে যুদ্ধের বহু কাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা শুনলাম। সন্ধ্যা হতেই আমরা আগরতলা ফিরে আসি। পরদিন আমাদের কলকাতা যাবার কথা। বিএসএফ এর মালবাহী বিমানে আমাদের যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। খালেদ সকাল বেলা আমাদের বিদায় জানাতে এলেন। তিনি তার সুবিধা-অসুবিধা এবং আওয়ামী লীগ কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে যোগাযোগের অভাবের কথা জানান। কিছু দিন পূর্বে মুজিব বাহিনীর কার্যক্রমের সাথে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আমরা তা দূর করতে সক্ষম হই। দুইদিন পর কলকাতায় এসে আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আমরা সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। এই সময় খবর আসে যে খালেদ মোশাররফ আহত হয়েছেন। তাকে লক্ষ্মী হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

আওয়ামীলীগের এই বৈঠক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তখন বুঝতে পারি যে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ও যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি সব কিছু মিলে আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। এ সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আসে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিয়ে আমরা দেশের ভেতরে যেতে পারি কি-না। ভূখণ্ড দখলের ব্যাপারে ভারত সরকার সাহায্যের আশ্বাস দেয়। আমরা এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করি। আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষই আমাদের সংগ্রামের পক্ষে। হানাদার বাহিনীর বন্দুক কামানের বাইরে সারা দেশই বলতে গেলে স্বাধীন। আমাদের তাই নতুন করে ভূ-খণ্ড দখলের প্রয়োজন নেই।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম হই। জুলাই মাসের পর মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। শত্রুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভয়ভীতি। বিশ্বব্যাংকের একটি দল আগষ্ট মাসে ঢাকা মাসে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাক সরকার সাহায্য পাবে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ১২ই আগষ্ট তারিখে। বাংলাদেশ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে পাক সরকার যে প্রচার চালাচ্ছিল এই গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে তা অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গেরিলা যোদ্ধারা অতি অল্প সময়ে শত্রু হননের কলা কৌশল রপ্ত করে। প্রথমদিকে পাক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা কৌশল পরিবর্তন করে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

জুন মাসের এক ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। কুষ্টিয়া কলেজের ছাত্র বীর যোদ্ধা তারেক। এক সম্মুখ সমরে তারেক শহীদ হয়। কৃষ্ণনগর ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছি। শুনলাম, তারেক দলবল নিয়ে যুদ্ধে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসলো, কিন্তু তারেক ফিরে আসলো না। জরুরী কাজে আমার কলকাতা ফিরে আসা দরকার। ক্যাম্পের বাইরে ৪টি ছেলেকে দেখতে পাই। তাদের মুখে শুনলাম কিভাবে তারেক বীরের মত শহীদ হয়েছে। আমি তাদের বললাম, যুদ্ধে বিজয় বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হলো বীরত্বের কথা। আমরা তারেকের গর্বে বেঁচে থাকবো। তারেক শহীদ হলেও তার একটা জিনিস পাওয়া আছে। তা'হলো তার বন্ধুদের কাছ থেকে সম্মান। তাঁকে সবাই সেই সম্মান দেখাতে হবে। তোমরা তার লাশ আনতে পারোনি। তার আত্মাকে তোমরা নিয়ে এসেছো। এসো, আমরা তাকে সম্মান করি। সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। পতাকা অর্ধনমিত রাখা হলো। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তারেককে স্মরণ করলাম। সবার চোখে নেমে এলো অশ্রু ধারা। ধরা গলায় আবার গাইলাম 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'।

অন্য একদিনের ঘটনা। শিকারপুর ক্যাম্পে। তওফিক এলাহী এই ক্যাম্পের অধিনায়ক যুদ্ধে একজন আনসার মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে। সহযোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাশ নিয়ে আসে। বুট পায়ে সামরিক পোষাক পরে ছাউনীর সবুজ ঘাসে শুয়ে আছে শহীদ ভাই। বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শহীদের শরীর। তাকে সামরিক কায়দায় দাফন করে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এসে দেখি, শহীদের স্ত্রী। কোলে অবুঝ পুত্র। সাথে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। জানিনা, আজ তারা কে কোথায় কেমন আছে। যুদ্ধকালে এই পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নিয়েছিল বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস। এমনি শত শত মুক্তিযোদ্ধা শুয়ে আছে সিলেটের বালটি সীমান্তে। তাদের শেষ ইচ্ছানুযায়ী বাংলার মাটিতে তাদের কবর দেয়া হয়। শুধু বালটি নয় ২৪ পরগনায় টাকি পর্যন্ত পুরো সীমান্তে শহীদের অসংখ্য কবর রয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করার সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে আমি সেখানে একটা সংযোগ রাখার চেষ্টা করলাম। সেখানে আমার তদারকি মোশতাক আহমদ কিছুতেই পছন্দ করতেন না। খন্দকার মোশতাক মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিব করেছেন। হোসেন আলী কলকাতা মিশনের প্রধান হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। হোসেন আলী থেকে শুরু করে কলকাতা মিশন ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন, তা ভুলবার নয়।

পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি প্রচার সেল খোলা হয়। আমার বন্ধু ও সহকারী মওদুদ আহমদ এ সেলে কাজ করতেন। এ সময়ে তার একটি পুস্তক বিদেশ অফিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মান্নান সাহেব জয় বাংলা পত্রিকা ও বেতার পরিচালনার দায়িত্ব পালন

করেন। ডাঃ টি হোসেন থাকেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বে। তিনি যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন শিবিরে আহতদের গুরুত্ব চালা করেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের 'প্রকাশনা সেল' কে একটি নতুন দায়িত্ব দেয়া হয়। বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে তাদের সাথে যোগাযোগ দায়িত্ব এরা পালন করতে থাকে। মিঃ বটমলির নেতৃত্বে একটি বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করে। এদের কলকাতা আসার কথা ছিল। তাদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে আমরা একটি ছোট্ট দল গঠন করি। এই দলে সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ টি হোসেন, ডঃ স্বদেশ বোস সহ আরো অনেকে ছিলেন। বেনাপোলের ডাক বাংলাতে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের লোকদের বিভিন্ন শিবিরে পোষ্টার ও ফেট্টনসহ পাঠাই। প্রতিনিধিদল আসেন বেশ বিলম্বে। বটমলি বলেন, তারা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবেন। আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান মানুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি বলেছিলাম যে আমরা বুদ্ধি বিবেকহীন মানুষের অত্যাচারে আজ দেশ ছাড়া, গৃহহারা। বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন মানুষের সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষায় আছি। তাই তাঁর এই পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের সাথে আমাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য সব কিছু করার আশ্বাস দেন।

টেড কেনেডী আসেন একবার। তাঁর সাথে আমাদের প্রতিনিধিদলের দেখা হয়। আমি ছাড়াও প্রতিনিধিদলে ছিলেন ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ স্বদেশ বোস ও মুস্তফা সারওয়ার। কেনেডী প্রথমেই জানতে চান, আমাদের জন্যে তারা কি করতে পারেন। আমি বললাম, মার্কিন জনগণ, সে দেশের পত্র-পত্রিকা ও কেনেডী আমাদের জন্যে যা করেছেন, এ জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আমি আরো বলি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি কিছুই না করেন, তাহলেই খুশী। সফরের পর কেনেডীর রিপোর্ট আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরমভাবে দেখা দেয়। এই উচ্চাভিলাষ যুবক, ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধা, সিপাই, চাকরিজীবী সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল তবে উচ্চাভিলাষীর সংখ্যা তত বেশী ছিল না।

মিলিটারীদের প্রতি যুবকদের একটা চরম অবিশ্বাস ছিল। তাদের অভিযোগ, এককালে এরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থাকায় তাদের ভাবধারা প্রভাবান্বিত। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দিলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আত্মবিকাশে চরম বিপর্যয় ঘটবে।

অপরদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে আওয়ামী লীগের যুবকদের প্রতি তেমনি অবিশ্বাস। এর মধ্যে মুজিব বাহিনী সৃষ্টির ফলে এই অবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। একজন সংসদ সদস্য থাকা সত্ত্বেও ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহু সামরিক অফিসারের মধ্যে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের বক্তব্য ছিল সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিনায়ক হওয়া উচিত নয়।

জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ প্রমুখ ওসমানী সম্পর্কে এ ধরনের উদাসীন উক্তি করেছেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা তখন থেকেই শুরু হয়। শফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ এই তিনজনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে আমার ধারণা। শফিউল্লাহ ও খালেদ দু'জনেই যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। এরা চিরকাল বীর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জিয়ার তেমন কোন বীরত্বের নজির নেই। তবে তাঁর মধ্যে ক্ষমতার অস্পষ্ট প্রস্তুতি তখন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। নুরুল ইসলাম শিশু প্রধানমন্ত্রীর মিলিটারী সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলতেন, “সামরিক বাহিনীর সকল অফিসারের সহযোগিতা ও সম্মান আমাদের অর্জন করতে হবে। তবে আমাদের প্রতি এদের আস্থার অভাব স্পষ্টতই দেখা যায়। শিশু তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের কাছে আছেন ও থাকবেন। আমাদের কতটুকু কাজে লাগবে জানিনা। তবে তার মাধ্যমে সামরিক অফিসারদের আস্থা ও সম্মান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। ওদের এটাও বুঝানো দরকার যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ অচল এবং নতুন দেশ গড়াও অসম্ভব। তাই দেশপ্রেমের তাগিদে যারা অস্ত্র ধরেছেন, একই কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে ওদের কাতার বন্দী হওয়াও উচিত।

সামরিক বাহিনীর সাথে মুজিব বাহিনীর, মুজিব বাহিনীর সাথে অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতি দলের নেতা-কর্মীদের খুটিনাটি বিরোধ দেখা দেয়। এসব বিষয় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকেও আলোচিত হয়। তাজউদ্দিন ভাই এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক মূল্যায়নের নির্দেশ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল কে বা কারা পাকিস্তানী ভাবধারায় অগণতান্ত্রিক ও স্বৈচ্ছাচারী গণবিরোধী মনোভাবে প্রভাবান্বিত বা কে তা নন, এর বিচার শুধু ভবিষ্যতেই সম্ভব।

নয় মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের তাজউদ্দিন ভাই এর সেই আবেদন কতটুকু সফল হয়েছিল তা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলবে। প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে একজন করে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হয়। বেশীর ভাগ লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন সংসদ সদস্য। সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

মাগুরা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিন ও তওফিক এলাহীর অবদান স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে। একজন ছেলেদের সাথে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন, যিনি পরে ঢাকার জেলা জজ হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি ব্যাপক ও সম্মিলিত আন্দোলন ছিল।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস থেকে যে সব অফিসার যোগ দেন, এদের উচ্চভিলাসী লোকের অভাব ছিলনা। আবার এদের মধ্যে বেশীর ভাগ অফিসারই অসীম সাহসিকতা, ত্যাগ ও কর্মসম্পূর্ণতার পরিচয় দেন। এখানে সিভিল সার্ভিসের অনেকের মধ্যে পদবী মেজাজের রেশ ছিল। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ দেখা দেয়। এই পদবী জনিত মনোভাবের কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এসব পদবী মনোভাবাপন্ন অফিসারদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, ফাইলের খেলা, কলম পিষে নোট লেখা, লাল

ফিতাতে বাধা এমন এক পর্যায়ে এলো যে পুরা ৪/৫ তলা বাড়ী প্রবাসী সরকারের অফিসে পরিণত হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপকতায় এদের মিশিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এরা একটি ভিন্ন মনোভাব ও ভিন্ন স্রোত হয়ে দেশে ফিরে আসে। কেবিনেটে তাজউদ্দিন ভাই এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকে চরম অসন্তোষের বারুদ নিয়ে বসেছিলেন খন্দকার মোশতাক। ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি ভিন্ন মনোভাব, যে কোন কারণেই হোক না কেন, মোশতাক অনেক কাজেই বাধা সৃষ্টি করেছেন।

মোশতাক কখনো শেখ মনিসহ যুব নেতাদের উস্কিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। মোশতাকের ভাবশিষ্য তাহের ঠাকুর একবার স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের দিয়ে ধর্মঘট করার ব্যবস্থাও পাকা পোক্ত করেন। অবশ্য এসব সফল হয়নি। সাধারণ কর্মীদের সংগ্রামের প্রতি ছিল সমর্থন আর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ছিল তাদের গভীর আস্থা।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের দলগত দিক থেকে তাজউদ্দিন ভাই এর প্রতি মিজান চৌধুরীর একটি ক্ষোভ ছিল। প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাজউদ্দিন ভাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়েননি।

আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুলোর দাবী ছিল একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করার। আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে সরকার গঠন যুক্তিযুক্ত হবে না। সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবীদারদের কেউ কেউ ভারতবর্ষের বন্ধু বান্ধবদের মাঝে লবি সৃষ্টি করতে কুষ্ঠা বোধ করেননি।

ভারত সিপিআই ও সিপিআই (এম) এর কংগ্রেসের ওপর প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। তাদের কাছ থেকেও সর্বদলীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে আনাগোনা শোনা যেতে লাগলো।

এসবের অবসান ঘটাবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সাথে পরামর্শ করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। এতে ভাসানী, মনি সিংহ ও মোজাফফর আহমদ সদস্য হলেন। উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সেরনিয়াবাত এই প্রস্তাবের নেতৃত্ব দেন। শেখ আজিজ, শাহ মোয়াজ্জেমসহ আরো কেউ কেউ নেপথ্যে থেকে এই প্রস্তাব চাপা করেন। অবশ্য আলোচনার পর এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

যুদ্ধকালে তাজউদ্দিন ভাইকে ঘায়েল করার জন্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল কম চেষ্টা করেনি। এই সব প্রচেষ্টা অনেক সময় সামগ্রিক সংগ্রামকে ব্যাহত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন কিছুই বলা সম্ভব হতো না, তখন তাকে উচ্চাভিলাসী রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সে সময় কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে ভারতে এসে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন।

তাজউদ্দিন ভাই বহুদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুকেই তার জীবনের একমাত্র নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এসব ভাবতে হচ্ছে বলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। সহকর্মীদের মাঝে কাউকে খুঁজতেন তার এই ভার বইতে। মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে কখনোই অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই তাকে অনেক কষ্ট ও বেগ পেতে হয়েছে। কর্তব্যে অটল, নীতিতে দৃঢ়, কঠিন প্রত্যয় নিয়ে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীতে তার সংস্পর্শের লোকেরা মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব, মিসেস গান্ধী, সরকারী কর্মচারী, সামরিক কর্মচারীর বিএসএফ থেকে বিভিন্ন এজেন্সী সবাই মুগ্ধ ছিলেন। এদের সকলের সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হন। গান্ধী ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয় নেতৃত্ব তাজউদ্দিন ভাই এর মত চরিত্রের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন। দলের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আমাদের সামরিকও বেসামরিক কর্মচারীদের বিপুল অংশ তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। তিনি একজন বড় নেতা ছিলেন। তার চিন্তাকর্ম ও ভাবধারার সাথে দলের এবং কেবিনেটের খুব কম লোকেরই ছিল। কেবিনেটের মধ্যে মনসুর ভাই ও হেনা ভাই একাগ্রমন নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। তবে তাজউদ্দিন ভাই এর সাথে প্রধানমন্ত্রীর দাবী কমবেশী যাই থাক না কেন, সমান থাকার কারণেই হোক, এরা খুব একাত্ম হতে পারেননি।

ইয়াহিয়ার কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন চলছে। এই বিচারের বিরুদ্ধে আমরা বিদেশে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমাদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। লন্ডনের ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে চিঠি লিখে তাকে জানাই সেখানে বাংলাদেশ কমিটির সাথে যোগাযোগ করে জেনেভা কনভেনশনের ৪নং ধারা মতে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি-না। কোন যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্মুখ সমরে যারা লিগ, তাদের গ্রেফতার ও বিচারের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশনের বিধি নিষেধ রয়েছে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর বিচার আইনসিদ্ধ ছিল না। পাকিস্তান জেনেভা কনভেনশন মানতে বাধ্য থাকায় এই মর্মে কোন বৃটিশ নামী কৌশলীর একটি মতামত গ্রহণ করা আবশ্যিক।

তাহাড়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শন ম্যাকব্রাইডের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ লিখিত মতানুযায়ী জেনেভাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমরা আবেদন করতে পারি। ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরী পৃথক পৃথকভাবে লিখে জানান, এ ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাইকে এগুলো অবহিত করার পর তিনি আনন্দিত হন। পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী হিসেবে এ ব্যাপারে খন্দকার মোশতাকের মত নেয়া প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে খন্দকার মোশতাকের সাথে দেখা করতে পাঠান। মোশতাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করার জন্যে সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তার এই বক্তব্য আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। তিনি বলেন, You must

decide, Whether you want Sheikh Mujibor Independence. You can't have both. আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, We wan't both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete. আমি বুঝলাম, তার মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পেছনে একটা যোগসূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে হলে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের আপোষ প্রয়োজন। এটাও এক ধরনের ব্যাক মেইল বলে আমার কাছে মনে হলো। আমি যে উদ্দেশ্যে গেছি মোশতাক সুকৌশলে যে তা এড়িয়ে গেলেন, তা বুঝতে আর বাকী রইলো না। খুব বিরক্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে তাজউদ্দিন ভাইকে এসব জানালাম।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার জন্যে আমি ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরীকে চিঠি লিখি। ম্যাকব্রাইড ও মিঃ চৌধুরী আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে পাক সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জেনেভা কনভেনশনের Article-4-এ কার্যকরী কোন ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকায় আমাদের পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বে এর একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইয়াহিয়া সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ম্যাকব্রাইড পরে ইসলামাবাদে গিয়ে আমাদের পক্ষে বলেন যে, শেখ মুজিবের বিচার আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন সময় বিদেশ থেকে নানা ধরনের লোক প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসতেন। অনেকের সাথেই তিনি দেখা করতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি আমাকে পাঠাতেন। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুস্তাভ পাপানেক কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার সাথে প্রাথমিক আলোচনার জন্যে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে প্রেরণ করেন। একটি হোটেলে তার সাথে আমি দেখা করতে যাই। তার সাথে আমার কোন পূর্ব পরিচয় নেই। পাপানেক বলেন সিআইএ বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে নয়। হোয়াইট হাউজের মত পাল্টাতে হলে আগে সিআইএর মত পাল্টাতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রয়োজন। মার্কিন প্রশাসন, বিশেষ করে সিআইএর মত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উত্তরে আমি জানাই, একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না, তেমনি এর প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝতে পারি না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, খোলা মেলা ব্যাপার। এর মধ্যে কোন আঁতাত বা ষড়যন্ত্রের চিহ্ন নেই। তাছাড়া সিআইএর মত একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা এই আন্দোলনের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পক্ষে কাজ করছেন। তাদের কোন বক্তব্য থাকলে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে খোলাখুলি উত্তর পেতে পারেন।

পাপানেকের প্রস্তাব নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। তবু প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তাকে চূড়ান্ত কথা জানানোর প্রতিশ্রুতি দেই। তাঁর প্রস্তাব শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সফর বা সিআই এর সাথে সাক্ষাত কোনটাতেই তিনি রাজী নন। আমি প্রধানমন্ত্রীর জবাব পাপানেককে জানাই। আমার জানা মতে বিদেশী ব্যক্তিদের মধ্যে এক মাত্র পাপানেকের সাথেই প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাত করেন নি। প্রফেসর রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পক্ষে কাজ করেন।

বৃটেনের লেবার পার্টি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। বৃটিশ জনমত গড়তে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। পিটার শোর এর সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত, মানবিক দিক, বাস্তবহারা সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। এই সাক্ষাৎকালে ডোনাল্ড ও আমি উপস্থিত ছিলাম। শোর ও ডোনাল্ড উভয়েই প্রধানমন্ত্রীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। পরে শোর সাংবাদিক সম্মেলনে তার মতামত ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্য বৃটেন ও ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

বৃটিশ এম.পি মাইকেল বার্নস এর সাথে দেখা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। স্থানটা ছিল, ২৪ পরগণা পার হয়ে বাংলার মাটিতে। তিনটা টুল ছিল। এগুলো অনায়াসে হাতে করে বহন করা যায়। পাশে যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য সামরিক টেলিফোন সেট। কিছু দূরে নদীর ওপার থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। এমনি করে টাইমস পত্রিকার নামী সাংবাদিক হেজেল হার্টস এর সাথেও সাক্ষাত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাদীতে আমাদের সুখবর আসতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসতে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। আন্দ্রে মালরো থেকে শুরু করে তরুণ বিটল এবং ইলুদি মেনহুইন থেকে রবিশংকর, কৃষ্ণকায় পপ সিঙ্গার কনসার্টের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন।

এছাড়া বাংলাদেশের ওপর গান রচনা ও রেকর্ড হয়ে আসছে। বিদেশী বন্ধুরা টাই পরে এসেছেন, তাতে বাংলাদেশের ছবি। বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে। ইতিমধ্যে নানা রকমের পরিকল্পনা এসেছে। ভারত বিরাট ও ব্যাপক দেশ। নানা ধর্ম বর্ণের লোক এখানে বাস করে। ভারতের সরকারও একটি বৈচিত্রময় সরকার। মিসেস গান্ধী তার নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছেন। অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাজ করছেন। বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর কাছে বহু প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো তিনি কিভাবে দেখেছেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমরা দূর থেকে যা বুঝেছি, দিল্লী থেকে বিভিন্ন এজেন্সী কাজ করতো। ভারতীয় বিশেষ মন্ত্রণালয় কলকাতায় অফিস খোলে। মিঃ রায় ও মিস অরুন্ধতী এ অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন। অপর একটি এজেন্সী ছিল 'র' এর পক্ষ থেকে লিয়াজোঁ করতেন মিঃ নাথ। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে হৃদরোগে তিনি মারা যান। মিঃ নাথ ছিলেন বাঙ্গালী সুপুরুষ ধীর স্থির সদাচার ব্যক্তিত্ব। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের থেকে তিনি পৃথক। কমাণ্ডার গোলক মজুমদার প্রথম থেকেই সর্ব পর্যায়ে আমাদের দেখাশুনা করতেন। ভারতের সামরিক

প্রতিনিধি জেনারেল সরকার আমাদের সামরিক কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এছাড়া ছিলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। দিল্লী থেকে লিয়াজেঁ রক্ষা করার জন্যে কেউ কেউ কলকাতায় থাকতেন।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতা সান্তার সাহেব আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। দিল্লী থেকেও অনেকে আসতেন। প্রধানমন্ত্রী যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে আমাকে নিয়োগ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক যোগাযোগ কখনই সফল রূপ নিতে পারেনি। তবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এটা খুবই কার্যকরী হয়। কিন্তু নীতিগতভাবে এই লিয়াজেঁর খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। এমনি বিভিন্ন মহল ও এজেন্সীর সাথে সমন্বয় করতে একটি মূল সূত্রের অভাব সর্বদা পরিণত হয়। মিঃ ডি পি ধরের দিল্লীতে আসার সময় পর্যন্ত এই বিভ্রান্তি বিরাজ করছিল। ডি পি ধর ছিলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। মিঃ ধর যদি মিসেস গান্ধীর পক্ষ থেকে কাজ করতেন, তা হলে হয়তো বহু ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। দিল্লী সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী, তাদের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তাদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতার মনোভাব। ফলে সামগ্রিক উদ্দেশ্য অনেক বার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ডি পি ধরের সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয় আলোচনা করেন। মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও ডি পি ধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শামসুল হককে দিল্লীতে আমাদের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়। শাহাবুদ্দিন প্রথম থেকেই পাক দুতাবাসের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমাদের সাথে চলে আসেন। একই সাথে দুতাবাসে প্রেস এটাচীও আসেন। এদের সাথে প্রথম থেকেই আমাদের যোগাযোগ হয়। প্রথম বার দিল্লী গিয়েই তাদের সাক্ষাত পাই। সেখানে অফিস করার ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করি। পরবর্তীকালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে আসার পর দিল্লীতে অফিস স্থাপনে সক্ষম হই। অক্টোবরের শেষ দিকে মিসেস গান্ধীর সাথে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার একটা বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগামী শীতেই বাংলাদেশ প্রশ্নে একটা অবশ্যম্ভাবী ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলতে গেলে অক্টোবর থেকেই আমরা ভারতের স্বীকৃতির জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকি।

১৫ই অক্টোবর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে স্বীকৃতির জন্যে পুনরায় অনুরোধ করেন। সেই চিঠিতে এটাও দাবী করা হয় যে বাংলাদেশের অর্ধেক ভূখণ্ড মুক্তিবাহিনীর দখলে ও বাংলাদেশ সরকারে শাসন ব্যবস্থা সেখানে চালু আছে। এই চিঠির সূত্র ধরে ১৫ই নভেম্বর অন্য একটি চিঠি লেখা হয়। সেই চিঠিতে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, স্বীকৃতির অনুরোধ, তৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি ছিল। এই চিঠি লেখা হয় ইন্দিরার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে। ২৩শে নভেম্বর অপর একটি চিঠি লেখা হয় তাঁর সফর শেষে।

এই চিঠিতে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও বিশ্ব জনমতের প্রতি ইয়াহিয়ার চরম উপেক্ষার কথা বলা হয়। এই চিঠিতে আরো ছিল শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা শীতের আগে দেশে ফিরে যেতে না পারলে বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এক চিঠিতে জানান, বাংলাদেশের দু'তৃতীয়াংশ মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকলেও পাক হানাদাররা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হামলা করে সম্পদ ধ্বংস করেছে। জবাবে ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে সশস্ত্র সহযোগিতার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের বন্ধুসুলভ সশস্ত্র বাহিনীকে সর্ব প্রকার সাহায্য ও বেসামরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পাক ভারত যুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠলো। স্বভাবতই বোঝা গেল পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত। অর্থাৎ পাকিস্তান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে চাচ্ছে।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতীয় সমর শক্তির সরাসরি যুদ্ধে অবতরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে এক জরুরী আবেদনে বলেন, বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেন বাংলাদেশে প্রবেশ না করে। আরো বলা হয় একটি যৌথ বাহিনী গঠন করতে হবে এবং এই বাহিনী দু'দেশের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। তাছাড়া বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর বাংলাদেশ যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখনই ভারতীয় বাহিনীকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লী থেকে ডি পি ধর কলকাতা আসেন। থিয়েটার রোড থেকে অন্য একটি বাড়ীতে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে ডি পি ধরের দু'দিনব্যাপী আলোচনা হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনায় পারস্পরিক সমঝোতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দেয়ার এটা ছিল যথোপযুক্ত সময়। হানাদার বাহিনী তখন সেনানিবাসের ভেতরে আবদ্ধ। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে পারলেই দেশে যাওয়া সম্ভব।

সীমান্তের ভেতরে-বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তখন উল্লাস দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। বিদেশী সাংবাদিকরা এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে। প্রধানমন্ত্রী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, তোমরা জানতে চাচ্ছ আমি কেমন আছি? সমস্তানের জন্মের কথা জনক না জানলে তার মর্মব্যথা তোমরা বুঝ? আমি একটি ধাত্রীর কাজ করেছি মাত্র, বাংলাদেশ ভূমিষ্ট হয়েছে। আর তার জনক রয়েছেন হানাদারদের কারাগারে। জাতির জনক হয়তো কিছুই জানে না। দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় তাজউদ্দিন ভাই কেঁদে ফেলেন। তিনি অবিলম্বে জাতির জনককে মুক্তি দেয়ার দাবী করেন।

৭ই ডিসেম্বর যশোর সেনানিবাসের পতন হয়। এরপর আমি বেশীর ভাগ দিন কাটিয়েছি অগ্রগামী দলের সাথে। আমি যশোরে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্যে

রওয়ানা হই। পরদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যাবেন। অগ্রগামী দলে আমি ও মুস্তফা সারওয়ার ছিলাম। পথে পথে মানুষের বিপুল উল্লাস। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে চলেছে। চারদিকে এই অস্ত্র দেখে মুস্তফা সারওয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, শান্তি শৃংখলা ফিরে আসবে তো?

যশোর সার্কিট হাউসে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে অস্ত্র জমা দেয়া হল। পথে দেখলাম, ট্রাক ভর্তি করে হানাদার বাহিনীর সদস্যদের নেয়া হচ্ছে। জনগণ এদের মেরে ফেলতে চায়। বহু সাবধানে ও কড়া প্রহরায় এদের ভারতে নেয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর অতি দ্রুত পুল, কালভার্ট মেরামত করে দেয়। কোথাও বেইলী ব্রীজ তৈরী করে দেয়া হয়।

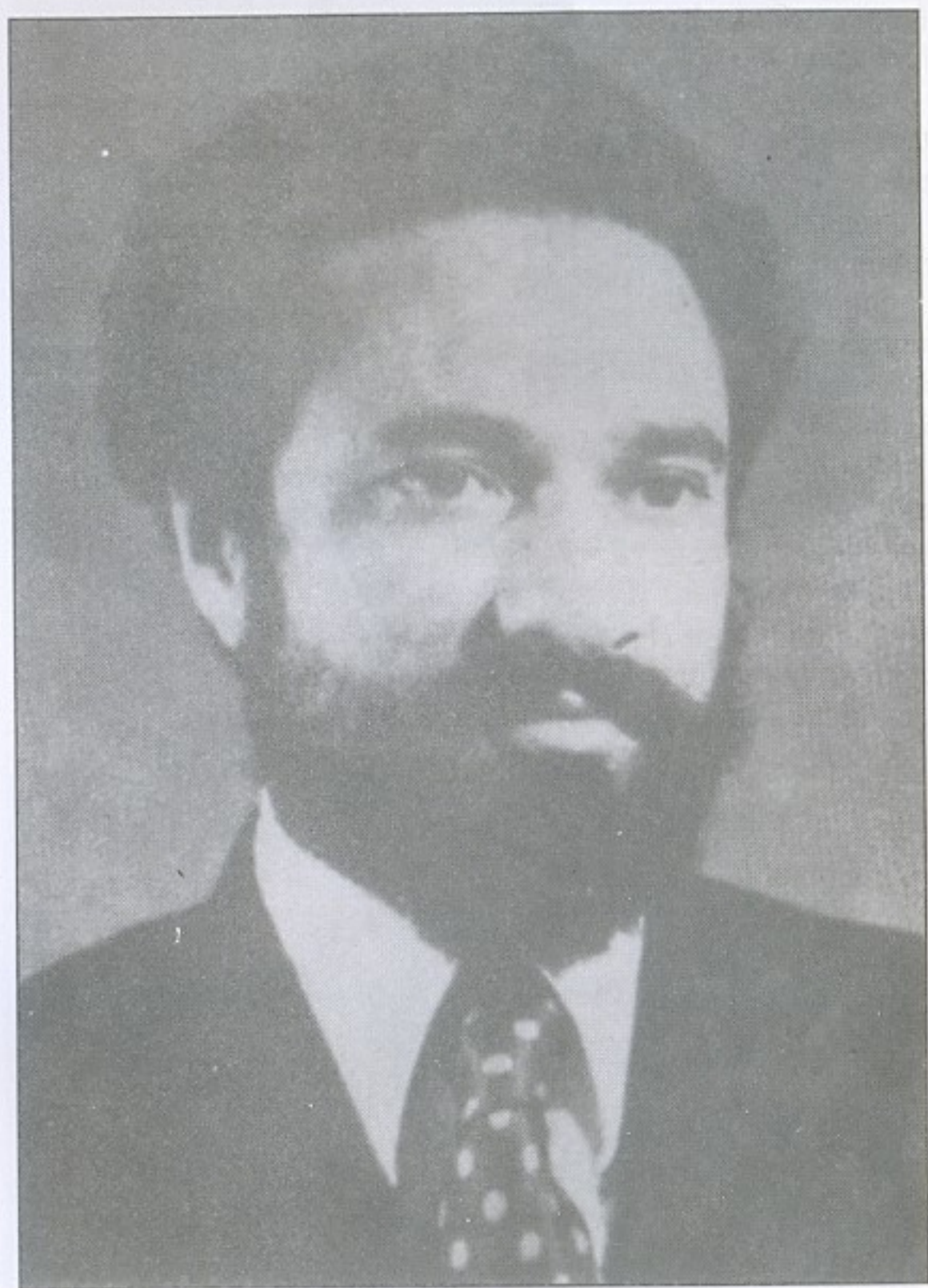
বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ছিলেন মুস্তফা সারওয়ার। রওশন আলী সহ কয়েকজন আওয়ামীলীগ নেতা এসে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমরা বেনাপোল সীমান্তে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। আমি ও মুস্তফা সারওয়ার সার্কিট হাউসের কক্ষে পাক সামরিক অফিসারের ব্যবহৃত পিস্তল ও কাপড় চোপড় পাই।

সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ আসা শুরু হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ আসছে কে কার আগে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখবে। শিল্পী মুস্তফা আজিজ বলেন, তিনি আমার একটি স্কেচ করবেন। তার ভাই মুস্তফা মনোয়ার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী আসলো। হাজার হাজার মানুষ জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নতুন উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়ার আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাতে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ীতে কলকাতা ফিরে আসি।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

জুন, ১৯৮৩



ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম



ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা এবং ওয়ার এন্ড ওয়ান্টের চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ-এর  
সঙ্গে আমীর-উল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প/বুড়িমারী, রংপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১



নদীয়া বেতায় মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন  
ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, অক্টোবর ১৯৭১



রানাঘাট ক্যাম্প

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রানাঘাট ক্যাম্পে আটক হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল।  
১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট রানাঘাট ক্যাম্পে আটক হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল।



শিকারপুর, পশ্চিমবাংলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে শীতবস্ত্র বিতরণ, ২০ নভেম্বর ১৯৭১



করিমপুর বি.ভি.এস.সি হাসপাতালে পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত ব্যক্তির পাশে, ২১ নভেম্বর ১৯৭১



যশোর টাউন হল মাঠ, সামনে বসা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রধানমন্ত্রী  
তাজউদ্দীন আহমদ ও পিছনে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১



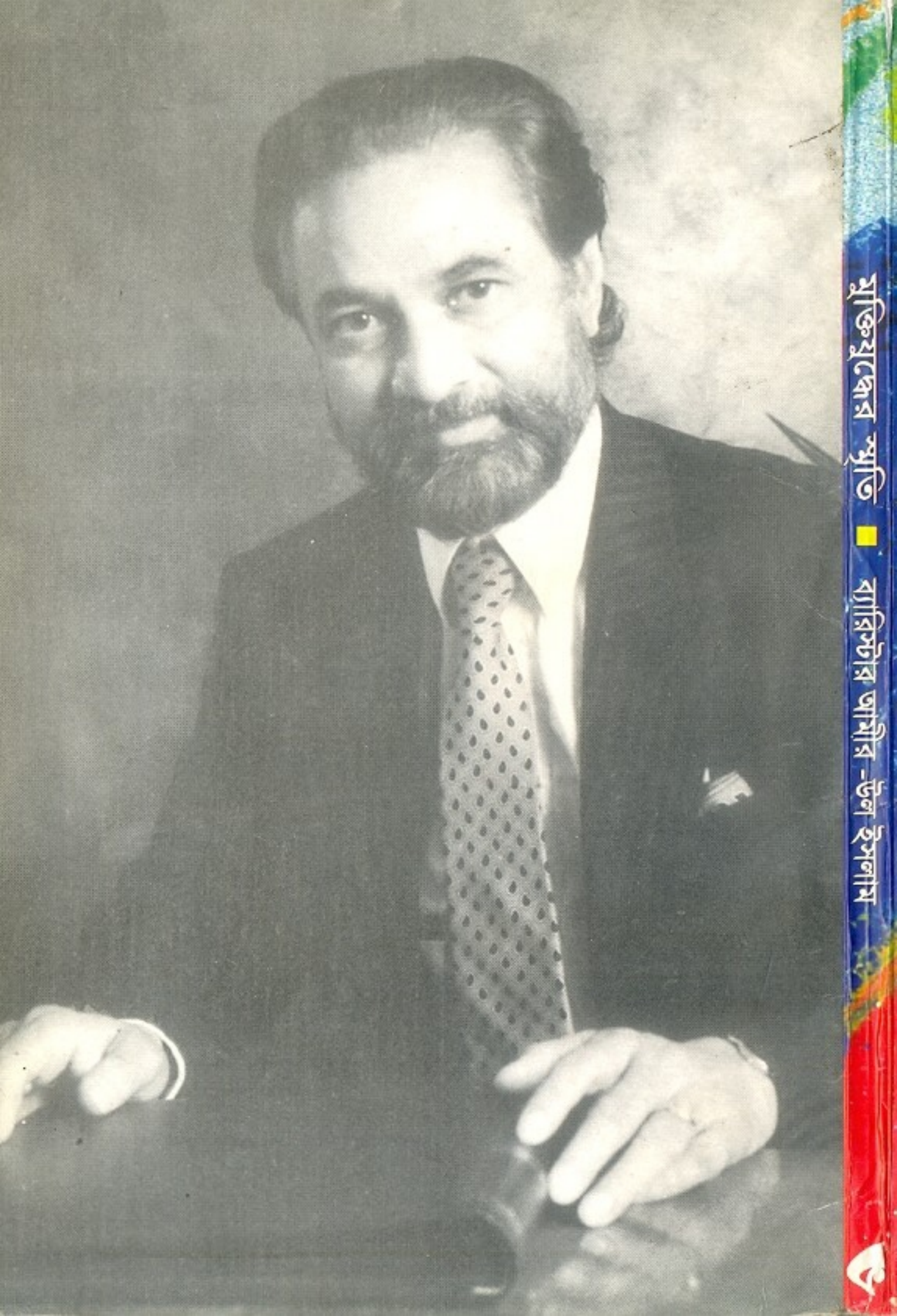
কুষ্টিয়া ডাকবাংলায় বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১



ডান দিক থেকে বসা এইচ, এম কামরুজ্জামান, ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ও আমীর-উল ইসলাম, মুক্ত কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ২ ডিসেম্বর ১৯৭১



মিত্র বাহিনীর সঙ্গে, ঝিকরগাছা, যশোর, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১



মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি



ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

